“মাধুর্য্য-কাদম্বিনী”-গ্রন্থ চক্রবর্ত্তী গায়।
সিদ্ধান্ত দেখহ তথা কিবা তাঁর ‘রায়’।।

-শ্রীল প্রভুপাদ

# মাধুর্য্য-কাদম্বিনী

## শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর

প্রকাশক ঃ ইস্‌কন প্রচার বিভাগের পক্ষে
শ্রীআনন্দবর্ধন দাস

প্রথম সংস্করণ ঃ নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, ৫১৫ গৌরাব্দ
(২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২)



আরো জানতে আগ্রহী পাঠকবৃন্দকে নিম্নোক্ত ঠিকানায়
পত্রবিনিময়ের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে ঃ
শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী
ইস্‌কন, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ
পিন-৭৪১৩১৩

ভিক্ষা ঃ ২৫ টাকা

# সূচীপত্র

## প্রথমামৃত বৃষ্টি ঃ

# ভক্তির সর্বোৎকর্ষতা

### মঙ্গলাচরণ

**হৃদ্‌বপ্রে নবভক্তিশষ্যবিততেঃ সঞ্জীবনী স্বগমা,-**
**রম্ভে কামতপর্ত্তুদাহদমনী বিশ্বাপগোল্লাসিনী।**
**দূরান্মে মরুশাখিনোহপি সরসীভাবায় ভূয়াৎ প্রভু-**
**শ্রীচৈতন্য কৃপা নিরঙ্কুশ-মহামাধুর্য্য-কাদম্বিনী।। ১।।**

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিরঙ্কুশ (অর্থাৎ বিধিনিষেধের অতীত) কৃপারূপ মহামাধুর্য্য কাদম্বিনী যা হৃদয়ক্ষেত্রে নববিধা ভক্তিরূপ শষ্য সমূহের প্রাণ প্রদান করে, যে কৃপার উদয়ের প্রারম্ভেই কামনা বাসনা রূপ গ্রীষ্মঋতুর তাপ বিনাশ হয়ে থাকে এবং নিখিল বিশ্বরূপ নদী উল্লাস লাভ করে। বহু দূরে মরুভূমিস্থিত শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় (আমি অধম জীব), আমার উপর সেই বারি বর্ষিত হয়ে আমার সরসতা সম্পাদন করুন।

**ভক্তিঃ পূর্বৈঃ শ্রিতা তাত্তু রসং পশ্যেদ্ যদাত্তধীঃ।**
**তং নৌমি সততং রূপনামপ্রিয় জনং হরেঃ।। ২।।**

যদিও পূর্ব মহাজনগণ (প্রহ্লাদ, ধ্রুব, চতুঃকুমার) ভক্তি পথ আশ্রয় করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে যাঁর কৃপায় লোকে বুদ্ধিলাভ করে সেই ভক্তিকে রসস্বরূপে দর্শন করছে, সেই শ্রীহরির প্রিয়জন শ্রীল রূপ গোস্বামীকে আমি সতত প্রণাম করি।

নিখিল প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ বা শব্দ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ। আমরা সেই শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভিত্তিতেই আলোচনায় অগ্রসর হব।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ নামক শ্রুতিতে উল্লেখ আছে **"ব্রহ্মপুচ্ছম প্রতিষ্ঠা"** (২/৫/২) অর্থাৎ পুচ্ছ সদৃশ ব্রহ্মই আশ্রয় স্বরূপ। অন্নময়, প্রাণময়াদি বিভিন্ন কোষ আলোচনা করার পর জানা যায় 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ আনন্দময় কোষ অন্য সমস্ত কোষের আশ্রয়। তারপর জানা যায় যে পরমানন্দময় পুরুষ পরাৎপর তত্ত্ব বা পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম থেকেও শ্রেষ্ঠ। সেই পরাৎপর তত্ত্ব পরমানন্দময় পুরুষ শ্রীভগবান হচ্ছেন 'রসস্বরূপ'। শ্রুতি বলে, **"রস বৈ সঃ, রসম্ হি এবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"** (২/৭/২) শ্রীভগবান স্বয়ং রসস্বরূপ এবং সেই রস লাভ করলেই জীব আনন্দ লাভ করে।

এ সম্বন্ধে সর্ববেদান্ত সার নিখিল শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই সাক্ষাৎ 'রস স্বরূপ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

> **"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্**
> **গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভূজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।**
> **মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাডবিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং**
> **বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।**

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ (বলরাম) সহঃ মথুরায় গমনকালে মল্লগণের নিকট বজ্রসদৃশ, সাধারণ মানুষের নিকট মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ও স্ত্রী সকলের নিকট মূর্ত্তিমান কন্দর্প, গোপগণের স্বজন, অসাধু রাজাগণের শাসনকর্তা, স্বীয় পিতামাতার নিকট শিশু, ভোজপতির (কংসের) চক্ষে সাক্ষাৎ মৃত্যু, অজ্ঞানীদের নিকট বিরাট পুরুষ, যোগীদিগের পরম তত্ত্ব এবং বৃষ্ণীবংশীয়দের নিকট পরম দেবতা রূপে প্রতিভাত হতে লাগলেন। (ভাঃ ১০/৪৩/১৭)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজের স্বরূপ নিরূপণ করেছেন



**"ব্রহ্মনোহি প্রতিষ্ঠাহম্"** (১৪-২৭) **"আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা"** অর্থাৎ ব্রহ্ম আমাকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। এই ভাবে এই সমস্ত প্রমাণ থেকে স্পষ্টতঃই জানা যায় যে, ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম, শুদ্ধসত্ত্বময়, নিজ নাম, রূপ, গুণ ও লীলার দ্বারা পরিচিত অনাদি বিগ্রহ। তিনি স্বেচ্ছায় জীবের কর্ণ, চক্ষু, মন ও বুদ্ধিতে অনুভূত হন। ঠিক যে ভাবে কৃষ্ণ ও রামরূপে যদুবংশে ও রঘুবংশে অবতীর্ন হয়ে লোক সমক্ষে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁর স্বরূপ শক্তি, ভক্তিও স্ব-প্রকাশিতা। স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হন বলে ভক্তির আর্বিভাবের কোন প্রকার কারণ থাকে না। তাঁর আবির্ভাব সমস্ত প্রকার ভৌতিক কারণ থেকে স্বতন্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে–

> **"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।**
> **অহৈতুক্য প্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।"**

যার দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের প্রতি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি জন্মে তাই জীবের পরম ধর্ম.........। (ভাঃ ১/২/৬)

এখানে "অহৈতুকী" অর্থ হচ্ছে কোন হেতু বা কারণ নেই। ভক্তির কোন ভৌতিক কারণ বা হেতু নেই।

ভগবান আরও বলেছেন,–

> **যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।**
> **ন নির্বিন্নো নাতি সক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।।**

যে ব্যক্তি কোনভাবে আমার কথার প্রতি আসক্ত বা কথা শ্রবণে শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন এবং যিনি অবিরক্ত কিন্তু অনাসক্ত, তাঁর পক্ষে ভক্তিযোগ অনুশীলন সিদ্ধিদায়ক হয়ে থাকে (ভাঃ ১১-২০-৮)

"যদৃচ্ছয়ৈবোপচিতা" ভক্তি স্বেচ্ছায় বর্ধিত হয়। যদৃচ্ছায় ভক্তির উদয় হয়,

এইভাবে 'যদৃচ্ছা' শব্দের অর্থ স্বেচ্ছাই বলে জানতে হবে। অভিধান অনুসারে যদৃচ্ছা শব্দের অর্থ স্বেচ্ছা বা স্বতন্ত্র–কেউ কেউ 'যদৃচ্ছা' শব্দের অর্থ "কোন সৌভাগ্য ক্রমে"–এই রূপ ব্যাখ্যা করেন। এই প্রকার অর্থ এখানে উপযুক্ত হবে না। কেননা কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, এই সৌভাগ্যের হেতু কি? এই সৌভাগ্য কি শুভ কর্ম থেকে জাত সৌভাগ্য থেকে উৎপন্ন। তার অর্থ হবে ভক্তি জড় কর্মের অধীন, জড় কর্মের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এটি ভক্তির স্বপ্রকাশতা স্বভাব বা গুণের বিরুদ্ধ। পুণশ্চ কেউ যদি মনে করে যে, শুভ কর্মের অভাব জনিত সৌভাগ্য থেকে ভক্তির প্রকাশ হয়, তাহলে সেই ভাগ্য অনিবর্চনীয় ও অজ্ঞেয়। ভাগ্যের উদয়ের কারণ অজ্ঞাত হওয়ার দরুন তা অসিদ্ধ। যা নিজেই অসিদ্ধ, তা আবার অন্যের কারণ হবে কিরূপে?

ভগবদ্ কৃপার দ্বারা ভক্তি লাভ করা যায়– কেউ যদি এই মত পোষণ করেন, তাহলে সেই কৃপার কারণের অনুসন্ধান করতে হয়। উত্তোরত্তর অন্বেষণ দ্বারা কোন হেতু না পাওয়াতে তাতে অনবস্থা (inconclusive) দোষ এসে যায়। কেউ হয়ত বলতে পারে ভগবানের নিরুপাধি বা অহৈতুকী কৃপাই ভক্তির কারণ হতে পারে, কিন্তু তাহলে এই ভগবদ্‌কৃপা সকলের প্রতি দেখা যায় না কেন? শুধুমাত্র কতিপয় ভাগ্যবান ব্যক্তি ভক্তি লাভ করে থাকেন, সকলে ভক্তি লাভ করে না। যদি ভগবানের কৃপা অহৈতুকী হয় তবে সর্বত্র, সমভাবে ভক্তি পরিলক্ষিত হত। যেহেতু তা দেখা যায় না, সুতরাং সেক্ষেত্রে শ্রীভগবানের মধ্যে বৈষম্য দোষ মনে হলেও, তাঁর মধ্যে কোন দোষ নেই। তাই ভগবানের অহৈতুকী কৃপা যে ভক্তির কারণ তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ প্রশ্ন করতে পারে ভগবান যে, দুষ্টের দমন ও স্বভক্ত পালন করেন-তাতে কি তাঁর বৈষম্য ভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় না? প্রকৃতপক্ষে ভক্তের প্রতি এরূপ পক্ষপাতিত্ব ভগবানের দোষ নয়। বরং এটি তাঁর ভূষণ, ভগবানের ভক্ত বাৎসল্যতা-রূপ এই গুণটি অন্য সমস্ত গুণকে



পরাজিত করে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার ন্যায় অবস্থান করে থাকে। এ বিষয়ে এই গ্রন্থের অষ্টম বৃষ্টিতে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

ভক্তের অহৈতুকী কৃপা আর এক জনের ভক্তির কারণ হতে পারে, এবিষয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে পারে যে, ভগবানের ন্যায় ভক্তের মধ্যে বৈষম্য থাকতে পারে না। ভক্তের কৃপা সবার উপর হয় না, তা হলে ভক্তের কৃপা ভক্তির কারণ হবে কি করে? এ সমস্যার সমাধান শাস্ত্রানুমোদিত বা শাস্ত্রসিদ্ধ স্বভাব।

**"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।**
**প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি সঃ মধ্যমঃ।।"**

(ভাঃ ১১/২/৪৬)

তাই ভাগবতে মধ্যম ভক্তের বৈষম্য মূলক স্বভাবটি গ্রহণযোগ্য। সেই ভক্ত ভগবানের প্রতি প্রেম, ভক্তের সঙ্গে মৈত্রী, নিরীহের প্রতি কৃপা ও দ্বেষী জনের প্রতি উপক্ষো করে।

শ্রীভগবান হচ্ছেন ভক্তের অধীন। তাই তাঁর কৃপা ভক্তের কৃপার অনুগামীনি অর্থাৎ ভক্ত যাকে কৃপা করে তাঁর প্রতি ভগবানের কৃপা বর্ষিত হয়। এতে স্বভাবগত ভাবে কোন ব্যতিক্রম বা অসামঞ্জস্য নেই। এমনকি ভক্তের কৃপা ভক্তির কারণ বলে মনে হলেও, সেই ভক্তির প্রকৃত কারণ হচ্ছে, ভক্তি স্বয়ং, যিনি ভক্তের হৃদয়ে বাস করছেন। ভক্তের ভক্তি না থাকলে তাঁর পক্ষে অপরকে কৃপা করা সম্ভব নয়। ভক্তি হচ্ছে ভক্তের কৃপার কারণ; যা অন্য লোকের হৃদয়ে ভক্তির উদয় করায়। এভাবে একমাত্র ভক্তিই ভক্তির কারণ হওয়ায় ভক্তির স্বপ্রকাশত্ব ও স্বতন্ত্রতা স্বভাবটি সিদ্ধ হল।

**"যঃ কেনাপত্যতিভাগ্যেন জাত শ্রদ্ধোহস্য সেবনে"** অর্থাৎ "যে ব্যক্তি অতি সৌভাগ্যের ফলে শ্রীভগবানের সেবার প্রতি শ্রদ্ধালাভ করেন।" এই শ্লোকে যে অতিভাগ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এটি কোন ভক্তের কৃপা লাভ বুঝতে

হবে। ভক্তের কারুণ্য শুভ কর্ম-জনিত সৌভাগ্যকে অতিক্রম করে থাকে। প্রশ্ন হতে পারে, ভক্ত যখন ঈশ্বরের অধীন, তবে ঈশ্বরের প্রেরণা ব্যতিরেকে ভক্ত কৃপা করবেন কিরূপে? এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, ভগবানের নির্দেশের অপেক্ষা না করে ভক্তের পক্ষে কৃপা দান করা সম্ভব নয় অর্থাৎ ভগবানের নির্দেশের অপেক্ষা না করে ভক্ত কৃপা দান করতে পারেন। কারণ ভগবান স্বেচ্ছায় ভক্ত বশ্যতা স্বীকার করেন, নিজ ভক্তকে নিজের কৃপা প্রদানের শক্তি দান করে ভক্তের উৎকর্ষতা সাধন করেন। যদিও জীবের পূর্ব কর্মের ফলানুসারে জীবের বহিঃইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ ভগবান পরমাত্মা রূপে পর্যবেক্ষণ করেন, তিনি তাঁর ভক্তদের স্বপ্রসাদ রূপে বিশেষ কৃপা দান করে থাকেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান বলেছেন–

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বানপরামাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ।।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ।।

দেহ মন এবং কার্যকলাপ সংযত করার অভ্যাসের ফলে যোগীর জড় বন্ধন মুক্ত হয় এবং তিনি তখন আমার ধাম প্রাপ্ত হন।

হে ভারত, সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হও। তাঁর কৃপায় তুমি পরা শান্তি লাভ করবে এবং তাঁর নিত্য ধাম প্রাপ্ত হবে। (গীঃ ৬/১৫, ১৮/৬২)

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের কৃপা সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁর কৃপার দ্বারাই পরম শান্তি এবং তাঁর নিত্য ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রসাদের মাধ্যমে ভগবান ভক্তকে তাঁর কৃপা দান করার শক্তি প্রদান করে থাকেন। অন্য কথায় ভগবানের কৃপা ভক্তের কৃপার মাধ্যমে লাভ করা যায়। যে ভক্ত সেই কৃপা দান করেন তাঁর মাধ্যমে লাভ করা যায়। যেভাবে এবিষয়ে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।



**"স্বেচ্ছাবতারচরিতৈঃ.........**ভগবান স্বেচ্ছায় অবতীর্ন হন এবং লীলা করেন।
(ভাঃ ৪-৮-৫৭)

এবং "স্বেচ্ছাময়স্য" তাঁর স্ব-ইচ্ছায় (ভাঃ ১০/১৪/২)। এভাবে শত শত শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা, গৃহীত হয়েছে যে, ভগবান স্বেচ্ছায় এই বিশ্বে আবির্ভূত হন। তবুও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে কেউ বলতে পারে যে ভগবানের অবতরণের কারণ হচ্ছে ভূভার হরণ ও ধর্মসংস্থাপনাদি। ঠিক সেইরূপ কোন কোন সময়ে নিষ্কাম কর্ম ও অন্য পূণ্য কর্মাদিকে ভক্তির দ্বার বললেও কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,–

"যং না যোগেন সাংখ্যেন দান ব্রততপোহধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যা-স্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ।।"

যত্নের সাথে শুধুমাত্র যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, দান, ব্রত, জপ, যজ্ঞ, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, বেদ অধ্যয়ন, সন্ন্যাসাদি পালন করলেই ভক্তি লাভ করা যায় না। (ভাঃ ১১/১২/৯) এই শাস্ত্র বাক্যের দ্বারা দান ব্রতাদি যে, ভক্তির হেতু নয় তা সুস্পষ্ট হল। কিন্তু পুনশ্চ সেই শ্রীমদ্ভাগবতেই বলা হয়েছে-

দানব্রততপোহোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বি-বিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তি র্হি-সাধ্যতে ।।"

অর্থাৎ দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম ইত্যাদি শ্রেয়স্কর কার্যের দ্বারা ভক্তি সাধিত হয়।" (ভাঃ ১০/৪৭/২৪) এখানে দান ব্রতাদিকে ভক্তির সাধকত্ব বলা হয়েছে। এই দুটি শ্লোক পরস্পর বিরোধী বলে মনে হতে পারে, তাই বুঝতে হবে যে, দ্বিতীয় শ্লোকে যে দান, ব্রতাদির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি জ্ঞানাঙ্গ ভূত সাত্ত্বিক ভক্তিরই সাধন, কিন্তু প্রেমাঙ্গভুতা নির্গুণা ভক্তির জন্য প্রযোজ্য নয়। আবার এই শ্লোকে কথিত 'দান' কে বিষ্ণু বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে দান, ব্রত শব্দে একাদশী ব্রত, তপস্যা অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ভোগাদি ত্যাগ

ইত্যাদি–এরূপ ব্যাখ্যা করলে এই সমস্ত দান ব্রতাদি সাধন ভক্তির অঙ্গ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। "ভক্তির দ্বারা সঞ্জাত ভক্তিহেতু" এই কথা অনুসারে ভক্তিকেই ভক্তির হেতু বলা যায়। এই ভাবে ভক্তির অহৈতুকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে।

**শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।**
**তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।।**

হে ভগবান (বিভু), যারা শ্রেয়োলাভের একমাত্র পথ ভক্তিকে ত্যাগ করে কেবল জ্ঞানলাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তাদের তন্ডুলবিহীন তুষে আঘাতের ন্যায় ক্লেশই লাভ হয়। (ভাঃ ১০/১৪/৪)

**ত্যক্তা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোহথ পতেত্ততো যদি।**
**যত্র ক্ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কোবার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্মতঃ।।**

ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যিনি জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করেছেন, অপক্ক অবস্থায় যদি কোনো কারণে তাঁর পতনও হয়, তবুও তাঁর বিফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, অভক্ত যদি সর্বতোভাবে নৈমিত্তিক ধর্ম-অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়। তবুও তাতে তার কোনো লাভ হয় না।

(ভাঃ ১/৫/১৭)

**'পুরেহ ভূমন বহবোহপি যোগিন স্তদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া।**
**বিধুব্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেহঞ্জোহচ্যুত তে গতিং পরাম্।।**

পূর্বে এই জগতে বহুযোগী যোগ দ্বারা তোমার জ্ঞান লাভ না করতে পেরে শেষে তোমার নিকট সমস্ত চেষ্টা সমর্পন করেছিলেন। তার ফলে তোমার প্রতি ভক্তির প্রভাবে আত্মতত্ত্ব ও তোমাকে অবগত হয়ে পরম গতি অর্থাৎ তোমার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (ভাঃ ১০/১৪/৫)



এই শ্লোক গুলির মাধ্যমে জানা যায়, জ্ঞানী, কর্মী ও যোগীদের ফল লাভের জন্য ভক্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভক্তির স্বীয় ফলে প্রেম সিদ্ধির জন্য স্বপ্নেও জ্ঞান, যোগ বা কর্মের অপেক্ষা করতে হয় না। ভগবানে ভক্তি জন্মিলে তার পরিপক্ক অবস্থায় প্রেমফল অবশ্যই লাভ হবে। ভাগবতে ভগবান বলেছেন–

**"তস্মান্মদ্ভক্তি যুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মন।**
**ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।।"**

"এই জগতে যে ভক্ত মনোযোগ সহকারে আমার ভক্তি মূলক সেবায় নিযুক্ত আছে, তাঁর সিদ্ধি লাভের জন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোন প্রয়োজন নেই।"

(ভাঃ ১১/২০/৩১)

**ধর্ম্মান সন্ত্যাজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ।**

যিনি সমস্ত পথ বা ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার উপসনা করেন তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ। (ভাঃ ১১/১১/৩২)

উপরোক্ত শ্লোকসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আর অধিক কি বলা যায়? কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি অভ্যাসকারীদের ফল লাভ করতে ভক্তির অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভক্তিতে কর্ম জ্ঞানাদির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

**"যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।**
**যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।।**
**সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেহঞ্জসা।**
**স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি।।"**

কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান এবং ধর্ম পালনাদির দ্বারা জীবনের সিদ্ধি লাভ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগের মাধ্যমে সে সমস্ত ফল অনায়াসে লাভ করে থাকে। যদি কোন কারণে আমার ভক্ত স্বর্গলাভ, মুক্তিলাভ বা

আমার ধামে বাস করার ইচ্ছা করে তাও সে সহজে লাভ করতে পারে।

(ভাঃ ১১/২০/৩২-৩৩)

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে বলা হয়েছে–

**"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।**
**অপ্রাণস্যেব দেহস্য মন্ডনং লোকরঞ্জনম্।।"**

ভগবদভক্তি বিহীন উচ্চকূলে জন্ম, শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্র-জপ, তপস্যাদি লোকরঞ্জনের জন্য মৃত শরীরকে সাজানোর মতোই নিষ্ফল।" (হরিভক্তি সুধোদয় ৩/১১/১২) অর্থাৎ ভক্তি ব্যতিরেকে এই সমস্ত প্রচেষ্টা মূল্যহীন। যেভাবে শরীর আত্মার উপস্থিতির উপর নির্ভর করে অর্থাৎ প্রাণের অধীন। সেরূপ জ্ঞান, কর্ম ও যোগের প্রাণস্বরূপ হচ্ছেন পরম মহীয়সী ভক্তিদেবী। জ্ঞান, কর্মাদি ভক্তিরই অধীন। সেরূপ জ্ঞান, কর্ম ও যোগের প্রাণস্বরূপ হচ্ছেন পরম মহীয়সী ভক্তিদেবী। জ্ঞান, কর্মাদি ভক্তিরই অধীন। এছাড়া শ্রুতি শাস্ত্র অনুসারে জ্ঞান, কর্মাদির অনুষ্ঠান দেশ, কাল, পাত্র, দ্রব্য প্রভৃতির শুদ্ধতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে এরূপ হয় না। বিষ্ণু ধর্ম অনুসারে–

**"ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।**
**নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি শ্রীহরেনাম্নি লুব্ধক।।"**

"হে লুব্ধক! ভগবান শ্রীহরির নাম কীর্তনাদিতে দেশ, কাল ও শুদ্ধতাদির কোন নিয়ম নাই। বাস্তবে ভক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ ভক্তি স্বীয় সিদ্ধির জন্য কোনো কিছুর অপেক্ষা রাখে না।" (পদ্যাবলী ২৬, স্কন্ধ পুরাণ ও প্রভাসখন্ড থেকে উদ্ধৃত)

**সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা, ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।"**

হে ভৃগুবর। শ্রদ্ধা বা হেলায় একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ মনুষ্যমাত্রকেই পরিত্রাণ করে থাকে। ভক্তি দেশ, কাল এমনকি অনুশীলনের



শুদ্ধতার উপরও নির্ভর করে না। কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে এরূপ হয় না, সেখানে অল্প ত্রুটি প্রগতির বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় (পানীনিয় শিক্ষা ৫২)

**"মন্ত্রহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথো প্রযুক্তো না তদর্থমাহ।**
**যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাৎ স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হি হিনস্তি।।"**

মন্ত্র উচ্চারণে ত্রুটি হলে বা বর্ণ হীনতা প্রাপ্ত সেই মন্ত্র তো বিফল হবেই অধিকন্তু সেই মন্ত্র বজ্ররূপে যজমানের সর্বনাশ করবে। ঠিক যেভাবে ত্বষ্টবা ঋষি ইন্দ্রের শত্রু উৎপন্ন করার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানে তিনি "ইন্দ্র শত্রু" উচ্চারনে অতি সামান্য ভুল করেছিলেন। সেই শব্দগুলি বজ্রের ন্যায় কাজ করেছিল যার ফলে বৃত্রাসুর ইন্দ্র দ্বারা হত হয়েছিল।

অনুরূপভাবে জ্ঞানযোগ অনুশীলনের জন্যও অন্তঃকরণ শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে। নিষ্কাম কর্মযোগ অর্থাৎ ফলাকাঙ্খা-রহিত কর্মযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে অন্তকরণ বা হৃদয়ের শুদ্ধতা জন্মে। এভাবে জ্ঞানযোগে প্রবেশাধিকার নিষ্কাম কর্মযোগের অধীন। কোন জ্ঞানযোগী যদি ভুল বশতঃ সামান্য দূরাচার করে তবে শাস্ত্রে তাদেরকে বান্তাসী বা বমনভোজী বলে নিন্দা করা হয়েছে।

**"সবৈ বান্তস্য পত্রপ"** – (ভাঃ ৭-১৫-৩৬)

ঠিক যে ভাবে কংস, হিরন্যকশিপু, রাবনাদি যদিও মহান জ্ঞানী ছিলেন, তবুও তাদের চরিত্রের জন্য তারা নিন্দিত হয়েছিলেন। জ্ঞান অভ্যাসকারীগণের অসৎ আচরণ লেশ মাত্রও সাধুসম্মত নয়।

পক্ষান্তরে ভক্তি মার্গে কেউ কামাদি দোষে আক্রান্ত হলেও ভক্তিযোগ অভ্যাস করার অধিকার রয়েছে। ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা কামাদির সমস্ত মলিনতা দূর হয়ে থাকে।

**বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহনু শৃনুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।**
**ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।**

যে ব্যক্তি ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাদি কথা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবন করেন ও বর্ণনা করেন, তিনি ভগবানের প্রতি পরা ভক্তি লাভ করে অতিসত্ত্বর ধীর হন এবং হৃদরোগ-রূপ কামকে জয় করেন। (ভাঃ ১০/৩৩/৩৯)

এখানে "প্রতিলভ্য" অর্থাৎ লাভ করে এই অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, যখন সাধকের হৃদয়ে কামভাব থাকে তখন থেকেই ভক্তির আবির্ভাব হয়ে থাকে। ভক্তির আবির্ভবারের পর তার প্রভাবে কাম বাসনা দূরীভূত হয়। যেহেতু ভক্তি পরম স্বতন্ত্র তাই এরূপ হয়ে থাকে। পুনশ্চ বলা হচ্ছে, কামরূপ মলিনতা ভক্তের মধ্যে প্রকাশ হলেও, শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

**"অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।**
**সাধুবের স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।"**

অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কেননা তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত। (গীঃ ৯/৩০)

**বাধ্যমানোহপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈর জিতেন্দ্রিয়ঃ।**
**প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে।।**

"আমার প্রিয় উদ্ধব! আমার ভক্ত যদি জিতেন্দ্রিয় না হয়ে থাকে, তাঁর হৃদয় জড় বাসনার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর অনন্য ভক্তির দরুণ, সে তাঁর ইন্দ্রিয় ভোগের দ্বারা অভিভূত হবে না।" (ভাঃ ১১/১৪/১৮)

এ সমস্ত প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, কামনার দ্বারা দূষিত থাকা সত্ত্বেও যে সমস্ত ব্যক্তি ভক্তিযোগ অবলম্বন করেছেন, শাস্ত্রে কোথাও তাদের নিন্দা করা হয় নি।

যদিও অজামিল তার পুত্রস্নেহ বশতঃ সংকেতেই ভগবানের নাম উচ্চারণ করেছিল, তবুও বিষ্ণুদূতেরা তাকে একজন ভক্ত বলে বিচার করেছিলেন।



অজামিলের মতো নাম উচ্চারণকারীদের নামাভাষ মাত্র (শুদ্ধনাম নয়) হলেও শাস্ত্রোক্তি অনুসারে তারা সারা জগতে ভক্ত বলে প্রশংসিত হয়েছেন। এই সমস্ত শাস্ত্রোক্তি অনুসারে কর্ম, জ্ঞান, ও যোগাদিতে সিদ্ধি লাভের জন্য অন্তঃকরণ শুদ্ধি এবং দেশ দ্রব্যাদির শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে অর্থাৎ এগুলি কর্মাদির সাধক। এগুলির অভাবে বা সাধকের মধ্যে কোন প্রকার বিঘ্ন হলে এই পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, যা কর্মাদির বাধক। অধিকন্তু ভক্তি কর্ম, জ্ঞানাদির প্রাণদায়িনী হওয়ায় তারা ভক্তির অধীন, তাদের কোনো স্বতন্ত্রতা নেই। যা স্বতন্ত্র নয়, তা অন্য সাধনার দ্বারা সাধ্য ও বাধ্য। কিন্তু ভক্তির স্বাতন্ত্র্যতা অন্য কোনকিছুর দ্বারা প্রতিহত হয় না।

কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলে থাকেন ভক্তি কেবল জ্ঞানলাভের উপায় মাত্র। কিন্তু শাস্ত্রাদিতে জ্ঞান সাধ্য অর্থাৎ জ্ঞানের লক্ষ্য মোক্ষ থেকেও ভক্তির পরম উৎকর্ষতা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষনা করা হয়েছে।

**"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"** (ভাঃ ৫/৬/১৮)

ভগবান সহজে মুক্তি দেন কিন্তু ভক্তি দেন না।

**মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ।**
**সুদুর্লভো প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।।**

"হে মহামুনে! কোটি কোটি মুক্ত এবং সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে প্রশান্তাত্মা নারায়ণ পরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ। (ভাঃ ৬/১৪/৫) সর্ব শক্তিমান ভগবান স্বয়ং উপেন্দ্র হয়ে অর্থাৎ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাই হয়ে ইন্দ্রকে তার থেকে বড় করেছেন এবং তাকে সর্বতোভাবে পোষন করেছেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সহজেই বুঝতে পারেন যে এর দ্বারা ভগবান তাঁর পরম দয়ালুতা প্রকাশ করেছেন। এটি ভগবানের অপকর্ষ বা নিকৃষ্টতা নয়। ঠিক তদ্রুপ যদি কোন সময় জ্ঞান ভক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে বলে মনে হয়, তাহলে বুঝতে হবে ভক্তি কৃপা করে

জ্ঞানের সহায়িকা রূপে কাজ করেছেন। যদিও ভক্তি শুদ্ধসত্ত্ব, ত্রিগুণাতীত এবং পরম স্বতন্ত্র, তবুও সত্ত্ব গুণ অবলম্বনে সাত্ত্বিকী ভক্তি রূপে জ্ঞানাঙ্গ হয়ে জ্ঞানের পোষন করে থাকে। সুধীজনেরা এরূপ মনে করে থাকেন।

"ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা" (ভাঃ ১১/৩/৩১)

সাধনা ভক্তির ফল হচ্ছে প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তি সর্ব পুরুষার্থের শিরোমণি। এভাবে শ্রীভগবানের থেকে আবির্ভূতা ভগবানের ন্যায় তার স্বরূপ-ভূতা মহাশক্তি ভক্তিদেবীর সর্বব্যপকত্ব, সর্ব্বশীকারিত্ব, সর্ব-সঞ্জীবকত্ব, সর্বোৎকর্ষতা, পরম স্বাতন্ত্র্য এবং স্বপ্রকাশত্ব কিয়দংশ বর্ণিত হল। এত সব জানা সত্ত্বেও যদি কেউ ভক্তি ব্যতিরেকে অন্য পন্থা গ্রহণ করে, তাকে চেতনাবিহীন বলে জানতে হবে। তার সম্যগ্ দর্শনের অভাব। বলাই বাহুল্য যদি কেউ ভক্তি-মার্গ ত্যাগ করে, শাস্ত্র-অনুসারে সে মানুষই নয়।

**"কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেতরম্"**

সেই পরমেশ্বর ভগবানকে মনুষ্যেত্ত্বর প্রাণী ভিন্ন আর কে ভজন না করে?

সুতরাং মনুষ্য জন্ম লাভ করেও হরিভজনে যার প্রবৃত্তি না জন্মে, তার মনুষ্য আকারই সার, মনুষ্যত্বের যথার্থ বিকাশ ঘটে না।

–ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত মাধুর্য্য কাদম্বিনী–গ্রন্থে 'ভক্তির সর্বোৎকর্ষতা' নামক প্রথম-অমৃত-বৃষ্টি।।১।।

## দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টি ঃ

# ভক্তির শ্রদ্ধাদি ক্রমত্রয় এবং ভজন ক্রিয়া ভেদ

এই মাধুর্য্য কাদম্বিনী গ্রন্থে দ্বৈত-অদ্বৈত-বিষয়ে বাদ বিবাদের অবকাশ নাই, যারা মনে করেন যে ভক্তিসাধনায় দ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজন তারা গ্রন্থকারের "ঐশ্বর্যকাদম্বিনী" গ্রন্থে তা দর্শন করুন। কর্ম ও জ্ঞান রহিত শুদ্ধভক্তি কল্পলতার ন্যায় ইন্দ্রিয়রূপ ক্ষেত্রে আবির্ভূতা হন। মধুব্রত ভ্রমরের ন্যায় যে সমস্ত নিষ্ঠাবান ভক্ত ভক্তি বিনা অন্য কোন ফল লাভের আকাঙ্খা করেন না, সেই সৌভাগ্যবান ভক্তদের আশ্রয় স্বরূপ হচ্ছে এই ভক্তি। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানার্থে অনুকূল সেবা সম্পাদনই এই (ভক্তি) লতার প্রাণ স্বরূপ। স্পর্শমণির মতোই ভক্তির আবির্ভাব হৃদয় ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্রমশঃ লৌহপ্রায় জড় গুণসমূহ থেকে মুক্ত করে শুদ্ধ সুবর্ণ রূপ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত করায়। নব অঙ্কুরিত সাধনা-ভক্তিলতা উর্দ্ধমুখীভাবে দুটি পত্র প্রসব করে। এই দুটি পত্রের প্রথম পত্রটির নাম 'ক্লেশঘ্নী' অর্থাৎ সমস্ত প্রকার ভৌতিক দুঃখ দুর্দশা বিনাশক এবং দ্বিতীয়টির নাম হল 'শুভদা' অর্থাৎ সমস্ত শুভ প্রদান করে।

নতুন ভাবে অঙ্কুরিত পাতাগুলি উর্দ্ধমুখী হয়ে প্রকাশ পায়, পাতাগুলির উপর (সমতল) অংশটি অন্তরভাগ এবং পাতার নীচের অংশটি বহির্ভাগ।

পাতা দুটির অন্তরভাগ রাগ (রাগভক্তি) নামক রাজারই অধিকার, ভগবান সম্বন্ধীয় সব কিছুর প্রতি স্বাভাবিক লোভ থেকে উৎপন্ন হেতু এটি অত্যন্ত কোমল। ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ মমতার দরুণ এর এই উৎকৃষ্ট স্বভাব।

**"যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরু সুহৃদো দৈবমিষ্টম**

"আমি যাঁদের প্রিয় পুত্র, আত্মা, সখা, গুরু, সুহৃদ এবং ইষ্ট দেবতা"

(ভাঃ ৩/২৫/৩৮)

পাতা গুলির বহির্ভাগে বৈধ (বিধি ভক্তি) নামক আর একটি রাজার রাজত্ব, এই ভাগটি সামান্য কর্কশ, শাস্ত্র নিয়ম পালনের দ্বারা উৎপত্তির জন্য এটি কর্কশ লক্ষণ যুক্ত। এটি তুলনামূলক নিকৃষ্ট। কারণ ভগবানের প্রতি সম্ভ্রমতা যুক্ত সম্পর্কের দরুণ তাঁর প্রতি স্বাভাবিকী মমতাযুক্ত শুদ্ধ সম্বন্ধের অভাব।

**"তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।**

**শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম।।"**

হে ভারত, সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে যে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে তাকে অবশ্যই পরমাত্মা, পরম নিয়ন্তা এবং সমস্ত দুঃখ হরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করতে হবে। (ভাঃ ২/১/১৫)

রাগ এবং বৈধী ভক্তি উভয়ই প্রায় সমভাবে ক্লেশঘ্নী ও শুভদার লক্ষণ সমূহ প্রকাশ করে থাকেন। পাঁচ প্রকারের ক্লেশ ভক্তির দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যথা- **অবিদ্যা, অস্মিতা**, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ। ক্লেশের আক্ষরিক অর্থ-হল দুঃখ বা যন্ত্রনা ভোগ। কিন্তু এখানে ক্লেশ শব্দের অর্থ দুঃখের কারণ বলে বুঝতে হবে। তাদের সম্বন্ধে পতঞ্জলীর যোগ সূত্র সাধন-পাদের তৃতীয় সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলি প্রকৃত পক্ষে পাঁচ প্রকার অবিদ্যার কারণ। তাদের থেকে ঠিক বা ভুল কর্ম করার প্রবনতা জাগে। যার ফলে ধর্ম বা অধর্ম এবং এই ভাবে পাপ ও পূণ্য কর্ম হয়ে থাকে। পাপ কর্ম বা পূণ্য কর্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জীবের সৌভাগ্যে ও দুর্ভাগ্যের উদয় হয়।

**অবিদ্যাঃ** অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচি জ্ঞান, দুঃখকে সুখ অনুভব এবং অনাত্মাতে আত্মজ্ঞান করাকে অবিদ্যা বলা হয়।



**অস্মিতাঃ-** মিথ্যা অহঙ্কার, আমি ও আমার এরূপ দেহাত্মবুদ্ধি এবং প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে কেবল সত্য বলে মনে করা।

**রাগ ঃ-** আসক্তি, জড় সুখ লাভ ও দুঃখের নিবৃত্তির উপায়কে রাগ বলে। অথবা ইপ্সিত বস্তুর লাভের পর আরও বেশী লাভ করার বাসনাকে রাগ বলে।

**দ্বেষ ঃ-** ঘৃণা, দুঃখ বা দুঃখের কারণের প্রতি বিরক্তিকে দ্বেষ বলে।

**অভিনিবেশ ঃ-** দৈহিক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি। মৃত্যু এই সমস্ত দৈহিক সুখ থেকে বঞ্চিত করে বলে মরনের প্রতি ভয়কে অভিনিবেশ বলে।

আবার প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, রূঢ় বা কূট এবং বীজ এই চার প্রকার পাপের ফলকেও ক্লেশের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেভাবে উভয় প্রকার ভক্তি (রাগ ও বৈধী) ক্লেশের বিনাশ করে তদ্রুপ তারা উভয়েই শুভ বা মঙ্গল প্রদান করে।

**যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।**

**হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।**

যাঁর ভগবান শ্রীহরির প্রতি অকিঞ্চনা বা নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্তির উদয় হয়েছে, তার শরীরে সমস্ত দেবতা সহ সমস্ত সদ্গুণ বিরাজ করে। আর যে শ্রীহরির ভক্ত নয় তার সদ্গুণ বা কোথায়? অনিত্য জড় বাসনা যুক্ত মনোরথের দ্বারা সর্বদা তার চিত্ত বহির্জগতে ধাবিত হয়। (ভাঃ ৫/১৮/১২)

**"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।**

**প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।।"**

"ভক্তি, পরমেশ্বরের অনুভূতি এবং ভগবদ্ ভিন্ন অন্য বিষয়ের প্রতি বিরক্তি -ভগবানের আশ্রিত ভক্তের মধ্যে একই সময়ে এই তিনটি প্রকাশ লাভ করে। ঠিক যেভাবে ভোজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রতি গ্রাসে গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি এবং ক্ষুদা- নিবৃত্তি যুগপৎ হয়ে থাকে।" (ভাঃ ১১/২/৪২)

এই শ্লোকের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ভক্তির লক্ষণ স্বরূপ ক্লেশঘ্নী (শোকের বিনাশ) ও শুভদা (শুভ উদয়) নামক পত্র দুটির আবির্ভাব সমকালে হলেও অল্প অধিক পরিমানে উৎপত্তির তারতম্য আছে। এই অশুভ নিবৃত্তি ও শুভ প্রবৃত্তির একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে। এভাবে ভক্তি ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়ে থাকে। এই ক্রম অত্যন্ত সুক্ষ্ণ ও লক্ষ্য করা অত্যন্ত কঠিন (দুর্লক্ষ্য) হলেও তাদের লক্ষণ সমূহ পর্যবেক্ষণ বা যাচাই করে তত্ত্বজ্ঞ পন্ডিতেরা এই সমস্ত ক্রম বা স্তর নির্ধারন করেছেন।

যিনি ভক্তি লাভে অধিকারী, তার মধ্যে প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হয়ে থাকে, শ্রদ্ধা অর্থে–ভক্তি শাস্ত্রের বর্ণনার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রদ্ধার আর একটি অর্থ হচ্ছে শাস্ত্রে বর্ণিত সাধনা প্রণালী উৎসাহের সহিত পালন করার নিষ্কপট স্পৃহা। এই উভয় শ্রদ্ধাই আবার দু-ভাগে বিভক্ত। একপ্রকার স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা যা স্বভাব বশতঃ উদয় হয় এবং অন্যপ্রকার শ্রদ্ধা বলাদুৎপাদিতা অর্থাৎ যা অপরের দ্বারা বল পূর্বক প্রচারের মাধ্যমে উদয় হয় (এই ভাবে প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হয়)। এই শ্রদ্ধা লাভ হলে শ্রীগুরুর পাদ পদ্মে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক সদাচার জিজ্ঞাসার উদয় হয়।

শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করার দ্বারা সেই ব্যক্তি স্বজাতীয় স্নিগ্ধ বা স্নেহশীল ভক্তিপথে অভিজ্ঞ সাধুদের সঙ্গ করার সৌভাগ্য লাভ করে (এইভাবে শ্রদ্ধা থেকে সাধুসঙ্গ)

সাধুসঙ্গ লাভের পর ভজনক্রিয়া শুরু হয়। সাধক বিভিন্ন প্রকার ভক্তিমূলক সেবা করতে অভ্যাস করে বা ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গের অনুশীলন করে। ভজন ক্রিয়া দুই প্রকার–অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা।

অনিষ্ঠিতা ভক্তি ছয়টি বিভিন্ন স্তরে ভক্তের উন্নতির ক্রম সুনিশ্চিত করে। এই ছয়টি স্তর হল উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয় সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিনী।



**উৎসাহময়ী ঃ–** কোনো বিদ্যার্থী বাল্যকালে যখন প্রথমে অধ্যয়ন আরম্ভ করে, তখন সে মনে করে "ওঃ আমি কত বড় পন্ডিত হয়ে গেছি। সবাই আমার প্রশংসা করছে।" এই ভাবে সে মনে করে তার সকলের প্রশংসনীয় পান্ডিত্য উৎপন্ন হয়েছে। এরূপ মনে করে সে অধ্যয়ন বিষয়ে খুব উৎসাহ পায় ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে। ঠিক সেই ভাবে ভজনের প্রাথমিক অবস্থায় ভক্তের মধ্যে এরূপ উৎসাহময়ী চেষ্টা দেখা যায়। সব কিছু তার আয়ত্ত্ব হয়ে গেছে বলে মনে করার দুঃসাহস সে করে। ভক্তের এই স্তরকে উৎসাহময়ী স্তর বলা হয়।

**ঘনতরলা ঃ-** ঐ বালকটির শাস্ত্রভ্যাস কখন ঘন বা গাঢ় ও কখন তরল হয়। যখন শাস্ত্রের অর্থ ভাল ভাবে বুঝতে পারছে তখন খুব আনন্দের সঙ্গে শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোযোগী হচ্ছে। কখনো শাস্ত্রের মর্ম না বুঝতে পারার জন্য ও যথার্থ রস আস্বাদন না করতে পেরে শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রতি তার যত্ন শিথিল হয়ে যায়। ঠিক সেই ভাবে নতুন ভক্তের কখনো ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গ পালনের দ্বারা ভজন ক্রিয়ায় ঘনত্ব বা গাঢ়তা দেখা যায় এবং কখনো বা ভক্তির সব অঙ্গ যাজনের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করার দরুণ ভজন ক্রিয়ায় তরলতা বা শৈথিল্য দেখা যায়। এই জন্য ভক্তের এই অবস্থাকে "ঘনতরলা" বলা হয়।

**ব্যূঢ়বিকল্পা ঃ-** এই অবস্থায় ভক্ত কি প্রকার সাধনে নিযুক্ত হবে সে সম্বন্ধে ঠিক করতে পারে না। সে কখনো হয়ত মনে করে "আমি কি পারিবারিক জীবনে অবস্থান পূর্বক পুত্র কন্যাদিকে বৈষ্ণব করব। তাদেরকে ভগবৎ পরিচর্যায় নিযুক্ত করে সুখে গৃহে অবস্থান পূর্বক ভজন করে কাল যাপন করব অথবা পুত্র কন্যাদি সবাইকে পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য কোন প্রকার বিক্ষেপ রহিত হয়ে সম্পূর্ণ রূপে শ্রবন কীর্তনাদি ভক্তি অনুশীলনে যুক্ত থাকব?"

আমি কি আমার জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করব? সমস্ত

প্রকার জড় সুখ ভোগ করার পর যখন পরিশেষে আমি বুঝতে পারব যে, এই সম্পূর্ণ জগৎটি যন্ত্রনার দাবানল স্বরূপ, অর্থাৎ দুঃখময় তখনই সংসার ত্যাগ করব? অথবা এখনই সংসার ত্যাগ করা শ্রেয়? আবার শাস্ত্রে দেখা যায়–

**"যোপযতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা।**
**তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুংতৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্।।"**

'শ্রীকপিলদেব বলেছেন, "স্ত্রী সঙ্গকে তৃণাচ্ছাদিত অন্ধকূপের মতো নিজের মৃত্যু পথ বলে জানবে।" (ভাঃ ৩/৩১/৪০)

**"যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।**
**জহৌ যুবৈব মলদুত্তমশ্লোকলালসঃ।।"**

সুন্দরী স্ত্রী, অনুগত পুত্র, আত্মসমর্পিত সুহৃদ, সুবিস্তৃত সম্রাজ্য, হৃদয়ের সব কিছু বাসনা ও সকলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করা অত্যন্ত দূরহ। মহারাজ ভরতের সে সব ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি উত্তম শ্লোকের প্রতি আকর্ষিত হয়ে সে সমস্ত মলবৎ পরিত্যাগ করেছিলেন। (ভাঃ ৫/১৪/৪৩)

তাহলে আমি কি এই ভাবে এই যুবা অবস্থাতেই পারিবারিক জীবনকে ত্যাগ করব? পক্ষান্তরে তৎক্ষণাৎ সংসার ত্যাগ যুক্তি যুক্ত নয়, সন্ন্যাসের জন্য আমার বৃদ্ধ পিতামাতার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি উচিত নয়?

**"অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।**
**অনাথা মামৃতে দীনা ঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতা।।"**

আহা! আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা, শিশুসন্তান যুক্ত ভার্যা এবং পুত্রগণ, আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হয়ে দীনভাবে কি প্রকারে জীবন ধারণ করবে? (ভাঃ ১১/১৭/৫৭)

এছাড়াও কেউ যদি অতৃপ্ত অবস্থায় সংসার ত্যাগ করে, ত্যাগের পরেও তার মন সব সময় গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্ত থাকবে।



**এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।**
**অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোহন্ধং বিশতে তমঃ।।**

"এইরূপ গৃহ অভিলাষে বিক্ষিপ্ত চিত্ত অতৃপ্ত মূঢ় বুদ্ধি সম্পন্ন লোক সর্বদা আত্মীয় স্বজনদের চিন্তা করতে করতে মৃত্যুর পর অন্ধকারময় নরকে বা অতি তামসী যোনিতে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে।" (ভাঃ ১১/১৭/৫৮)

ভগবানের এই কথা অনুসারে, আমি বুঝতে পারছি যে আমার সংসার ত্যাগের ক্ষমতা নাই। তাই আপাততঃ আমি জীবন ধারণের জন্য কর্ম করে যাই। তারপর যথাসময়ে আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়ে গেলে আমি বৃন্দাবনে গিয়ে (রাত দিন) ২৪ ঘন্টাই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকব।

সর্বোপরি শাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে–

**"ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।।"**

"ভক্তিযোগ অনুশীলনের জন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য কোনোটিই মঙ্গলপ্রদ নয়।' (ভাঃ ১১/২০/৩১)

এই শ্লোক অনুসারে বৈরাগ্য দ্বারা ভক্তি জন্মিতে পারে না বলে ভক্তির জনকত্বরূপে বৈরাগ্যের দোষ। যদি ভক্তির দরুণ বৈরাগ্যের উদ্ভব হয়, তবে সেই বৈরাগ্য দোষাবহ নয় বরং ভক্তির একটি অনুভাব এবং ভক্তির অধীন। অর্থাৎ এরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা ভক্তিরই অনুভব হয় বলে এই বৈরাগ্য হচ্ছে ভক্তির অধীন।

অবশ্য ন্যায় বিচার অনুসারে–

**"যদ্‌যদাশ্রমমগাৎ স ভিক্ষুকস্তত্তদন্নপরিপূর্ণ মৈক্ষত"**

"ভিক্ষুক যে যে আশ্রমে গমন করলেন সেই সেই আশ্রমকেই অন্নের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখলেন।"

এই ন্যায় দ্বারা কখনো বা বৈরাগ্য অবলম্বনের সংকল্প জাগে। বৈরাগী জীবনে শরীর নির্বাহের জন্য কোন ঝামেলা থাকে না। তাই আমার হয়ত গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেওয়াই উচিত। কিন্তু অন্যদিকে আবার বলা হয়েছে–

**তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।**
**তাবন্মোহোহঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ।।**

শ্রীব্রহ্মা বললেন, "হে কৃষ্ণ! যে পর্যন্ত মানুষ আপনার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পন না করেছে, ততদিন পর্যন্ত জাগতিক কামনা বাসনা রূপ চোর তাদের বিবেককে হরণ করবে, গৃহ তাদের কারাগৃহ সদৃশ বন্ধনের কারণ হবে, আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভালবাসা বা মোহ পাদশৃঙ্খলরূপে তাদের বন্ধন করে রাখবে। (ভাঃ ১০/১৪/৩৬)

যারা আসক্ত কেবল তাদের জন্যই গৃহস্থ জীবন কারাগৃহ স্বরূপ। ভক্তের জন্য গৃহস্থ জীবন যাপন করা কোন ক্ষতিকর নয়। এইভাবে আমি গৃহেই অবস্থান করব এবং নামজপ করব কিংবা হয়ত শ্রবণ করব অথবা আমি সেবায় নিযুক্ত হব? অন্যথায় আমি অম্বরীষ মহারাজের ন্যায় গৃহস্থ জীবনে অবস্থান পূর্বক ভক্তির সকল অঙ্গ যাজন করব।" ভজন ক্রিয়ার এই প্রকার সংশয় জনিত জল্পনা কল্পনা থাকলে তাকে **ব্যূঢ়-বিকল্পা** বলা হয়।

**বিষয় সঙ্গরা (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সংঘর্ষ)** ঃ– শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

**বিষয়াবিষ্ট চিত্তানং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ।**
**বারুনীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ।।**

যার চিত্ত জড় বিষয়ে আবিষ্ট আছে, তার পক্ষে বিষ্ণুর প্রতি আবেশ বা বিষ্ণুভক্তি লাভ করা সুদুরপরাহত। পশ্চিম দিকে অবস্থিত কোন বস্তুকে কি পূর্ব দিকে গমন করলে পাওয়া যাবে?



যখন ভক্ত দেখে বিষয়-ভোগ বলপূর্বক তাকে বশীভূত করছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ভজনের প্রতি তার আসক্তিকে শিথিল করে দিচ্ছে। তখন যে স্থির করে যে সমস্ত প্রকার বিষয়াক্তি পরিত্যাগ পূর্বক ভগবানের দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়–যে বস্তু বা বিষয়ভোগকে সে ত্যাগ করতে চেষ্টা করছিল, পরিশেষে সেই বিষয় ভোগেই মত্ত হয়ে যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রকার ভক্তের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে–

**জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিন্নঃ সর্ব্বকর্মসু।**
**বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগে হপ্যনীশ্বরঃ।।**
**ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালূদৃঢ়নিশ্চয়ঃ।**
**জুষমানশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।**

(ভাঃ ১১/২০/২৭-২৮)

আমার কথার প্রতি আসক্তি এবং জড় বিষয় ভোগে বীতস্পৃহ আমার ভক্ত ভালভাবে জানে যে, ইন্দ্রিয় ভোগে দুর্দশা লাভ হয়। তবুও অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে তার জড় বাসনাকে পরিত্যাগ করতে পারে না। ফলস্বরূপ কখনো কখনো সেই প্রকার ভক্ত জড় ভোগে নিযুক্ত হয় যা কেবল দুঃখই প্রদান করে। তার ঐ প্রকার কর্মের প্রতি অনুশোচনা পূর্বক প্রেম, শ্রদ্ধা ও দৃঢ় বিশ্বাস-সহ আমার উপাসনা করা উচিত। (ভাঃ ১১/২০/২৭-২৮)

পূর্বাভ্যাস বশতঃ বিষয় ভোগের প্রতি তার বাসনার সঙ্গে ক্রমাগতভাবে সংগ্রামে কখনো তার জয় হয় এবং কখনো তার পরাজয় হয়। বিষয়ের সঙ্গে তার এই সংগ্রাম বা সংঘর্ষকে **বিষয়-সঙ্গরা** বলে।

**নিয়মাক্ষমা** (ব্রত বা শপথ রক্ষা করার অসমর্থতা)ঃ– তারপর ভক্ত স্থির করবে, "আজ থেকে আমি এই সংখ্যক নাম জপ করব এবং এত বার প্রণাম করব; আমি ভক্তদের সেবা করব। আমি ভগবানের কথা ব্যতিরেকে আর কোন

কথা বলব না এবং আমি সমস্ত প্রজল্পকারীদের সঙ্গ ত্যাগ করব অর্থাৎ আর তাদের সঙ্গ করব না।" যদিও ভক্ত প্রতিদিন এইরূপ মনস্থির করে, তবুও সব সময় সেগুলির পালনে সে সমর্থ হয় না। একে বলা হয় নিয়মাক্ষমা অর্থাৎ নিয়ম পালন করার অক্ষমতা। বিষয়সঙ্গরা ও নিয়মাক্ষমার মধ্যে পার্থক্য এই যে-বিষয়সঙ্গরার অর্থ হচ্ছে বিষয় ভোগ বা ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ করার অক্ষমতা আর নিয়মাক্ষমা অর্থাৎ ভক্তির উন্নতি সাধনে অক্ষমতা।

**তরঙ্গ রঙ্গিনী ঃ**- ভক্তি স্বাভাবিক ভাবেই সবাইকে আকর্ষণ করে। তাই ভক্তি যার মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ ভক্তের প্রতি সকলেই আকর্ষিত বা অনুরক্ত হয়ে থাকে। পূর্বতন মনীষিদের কথা অনুসারে, "জনসাধারণের অনুরাগের দরুণ সম্পদ লাভ হয়ে থাকে।" তখন ভক্তি থেকে লাভ, পূজা, ও প্রতিষ্ঠা আদি উৎপন্ন হয়। এগুলি ভক্তি লতার চুতঃপার্শ্বে উপশাখা মাত্র। এই উপশাখাগুলি ভক্তি সাগরের তরঙ্গ স্বরূপ। এই অবস্থায় ভক্ত উপশাখাগুলির সুযোগের মধ্যে নিজের সুখ (রঙ্গ) অনুসন্ধান করে, এই জন্য এই অবস্থাকে তরঙ্গ রঙ্গিনী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত 'মাধুর্য্য-কাদম্বিনী'-গ্রন্থে **'ভক্তির শ্রদ্ধাদি ক্রমত্রয় বর্ণনপূর্বক ভজন-ক্রিয়ার ভেদ-কথন'** নামক দ্বিতীয়-অমৃত-বৃষ্টি।।২।।

# তৃতীয়ামৃতবৃষ্টি ঃ
# অনর্থনিবৃত্তি

ভজনক্রিয়ার পর অনর্থ-নিবৃত্তি। সেই অনর্থ চার প্রকার যথা- **দুষ্কৃতোত্থ, সুকৃতোত্থ, অপরাধোত্থ এবং ভক্ত্যুত্থ**।

**দুষ্কৃতোত্থ এবং সুকৃতোত্থ অনর্থ ঃ**- পূর্ব বর্ণিত অবিদ্যা, অস্মিতাদি পাঁচ প্রকার ক্লেশই দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ।

পূর্ণ কর্ম থেকে উদ্ভূত অনর্থ হচ্ছে উপভোগের বাসনা। কোন কোন ঋষিরা পুণ্যকর্ম থেকে জাত অনর্থকে পাঁচ প্রকার ক্লেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। নানা প্রকার উপভোগের অভিনিবেশকে সুকৃতোত্থ অনর্থ বলে।

**অপরাধোত্থ অনর্থ ঃ**- অপরাধোত্থ অনর্থ বলতে এখানে নাম অপরাধ থেকে জাত অনর্থকেই বুঝতে হবে। মন্দিরে পালকি করে বা পাদুকাসহ প্রবেশাদি সেবা অপরাধকে নির্দেশ করা হয় না। আচার্যগণ নির্ণয় করেছেন যে, ভগবানের নাম কীর্তনের দ্বারা, স্তোত্রাদি পাঠের দ্বারা ও নিরন্তর ভগবদ্-সেবার দ্বারা প্রতিদিন জাত সেবা অপরাধের উপশম হয়ে থাকে। এই সমস্ত কার্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকলে সেবা আদি অপরাধের অঙ্কুরীভাব বা আবির্ভাব ঘটে না। কিন্তু যেহেতু নামবলে ও স্তোত্রাদি পাঠের দ্বারা সেবাপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং তার-সুযোগ নিয়ে কেউ যদি সেবা অপরাধ করতে থাকে তাহলে তা নাম অপরাধে পরিণত হবে এবং সেই অনর্থ তার গতিকে রোধ করবে।

**"নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিরিত্তি"**

এই ভাবে নাম বলে পাপ কর্ম করায় তা নামাপরাধ।

এই শ্লোকে যে 'নাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা ভক্তির সমস্ত অঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করে, যার দ্বারা অনর্থ বিনাশ হয়ে থাকে। দিব্য নাম হচ্ছে ভক্তির মূল অঙ্গ।

এমন কি ধর্ম শাস্ত্রানুসারেও, প্রায়শ্চিত দ্বারা পাপ ফল থেকে মুক্ত হয়ে যাব –এইরূপ মনে করে কেউ যেন পাপ না করে। – তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই প্রকার আচরণ করলে পাপের ফল বিনাশ হওয়ার পরিবর্তে বর্ধিত হবে। ভাগবতে বলা হয়েছে–

**ন হি অঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ ধর্মস্যোদ্ধবান্নপি।**
**ময়া ব্যবসিতঃ স্যান্ নিগুর্ণ ত্বাদ্ অনাশিসঃ।।**

"হে উদ্ভব, যেহেতু এই ভক্তিযোগের পন্থা আমি নিজে প্রতিষ্ঠিত করেছি তাই এটি দিব্য এবং সমস্ত প্রকার জড় উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত। এই পথ যে ভক্ত গ্রহণ করে তার অনুমাত্রও ধ্বংস হয় না। (ভাঃ ১১/২৯/২০)

**"বিশেষতোদশার্ণোহয়ং জপমাত্রেন সিদ্ধিদ।"**

দশ অক্ষর মন্ত্র জপ মাত্রই সিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে।

এই সমস্ত শাস্ত্র ব্যাক্যের দ্বারা ভক্তির অন্য অঙ্গ পালন না করার ফলে বা তাদের প্রতি অবহেলা করার ফলে কি কোন প্রকার নাম অপরাধ হচ্ছে? তার উত্তরে বলা হয়েছে–না, তা হতে পারে না। নাম বলে পাপ কর্ম অনুষ্ঠান করার অর্থ হচ্ছে যখন উদ্দেশ্য মূলক ভাবে, পাপকর্মের প্রতিক্রিয়াকে ভক্তির দ্বারা ধ্বংস করা যাবে–এরূপ মনে করে পাপ কর্ম করা হয়। পাপের অর্থ সেই সমস্ত কর্ম যা শাস্ত্রে নিন্দিত এবং যার জন্য প্রায়শ্চিত করতে হয়। কর্ম মার্গে যদি সমস্ত কিছু ক্রিয়া সঠিক ভাবে না করা হয়, শাস্ত্রে তা নিন্দিত হয় বা শাস্ত্র অনুসারে দোষাবহ হয়। কিন্তু ভক্তির সমস্ত অঙ্গ যাজন না করলে শাস্ত্রে তার নিন্দা দেখা যায় না। সুতরাং এ স্থলে অপরাধের কোন ভয় নেই।



**যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।**
**অজ্ঞঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্।।**

**যানাস্থায় নরো রাজন না প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।**
**ধাবন্ নিমিল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ।।"**

"হে মহারাজ! অজ্ঞমানবগণের অনায়াসে আত্মলাভের নিমিত্ত যে উপায় সকল শ্রীভগবান কর্তৃক কথিত হয়েছে, তাকেই ভাগবত ধর্ম বলে জানবে।। যে ভাগবত ধর্মের আশ্রয়ে মানব কখনই প্রমাদগ্রস্থ হন না; চক্ষুমুদ্রিত করে ধাবিত হলেও যে পথ হতে কখনই পদস্খলনের বা পতনের সম্ভাবনা নেই।

(ভাঃ ১১/২/৩৪-৩৫)

এখানে "নিমিল্য" শব্দের অর্থ হচ্ছে, যে লোকের চক্ষু আছে, কিন্তু সে সেগুলি বন্ধ করে রেখেছে। "ধাবন" শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্বাভাবিক ভাবে সঙ্গতি রক্ষা না রেখে পদক্ষেপ করা। 'ন স্খলেৎ" অর্থাৎ পদ স্খলন বা পতন হয় না।

অতএব উক্ত শ্লোকের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি ভাগবতধর্মের আশ্রয় করে (তার সমস্ত অঙ্গ জানা সত্ত্বেও) অজ্ঞের ন্যায় কোন কোন অঙ্গ যাজনের প্রতি অবহেলা করে মূল ধর্ম অনুষ্ঠান করলেও তার কোন অপরাধ হয় না বা সে ফলচ্যুত হয়ে তার লক্ষ্য থেকে বঞ্চিত হয় না।

এখানে "নিমিল্যন" (চক্ষু বন্ধ করার) শব্দের ব্যবহারে শ্রুতি, স্মৃতি আদি শাস্ত্র জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ এই রূপ বলা হচ্ছে না। কারণ তা মুখ্যার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। চক্ষু বন্ধ করে দৌড়ান বা জ্ঞাত সারে ভক্তির কোন কোন অঙ্গ পালনে অবহেলা করা এবং উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য পুরনের প্রচেষ্টা করা, ভক্তকে বত্রিশ প্রকার সেবা অপরাধ করার জন্য সুযোগ প্রদান করে না। যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই শ্লোকটি সেই লোকের জন্য প্রযোজ্য যে

ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত ভক্তি মার্গে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সে ক্ষেত্রে কোন প্রকার ইচ্ছাকৃত সেবা অপরাধ করার প্রশ্নই ওঠে না। কারো ইচ্ছাকৃত ভাবে মন্দিরে পালকিতে করে প্রবেশ করা বা পায়ে পাদুকা সহ প্রবেশ করা আদি বত্রিশটি সেবা অপরাধ করা উচিৎ নয়। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে সেবা অপরাধ করে শাস্ত্রে তাদেরকে দ্বিপদ পশু বলে নিন্দা করা হয়েছে–

**"হর্রের অপি অপরাধন যঃ কুর্য্যাৎ দ্বিপদ পাশংনঃ"**

বহুকাল পূর্বে হোক বা বর্তমানে হোক যদি অজ্ঞানতা বশতঃ অপরাধ হয়ে থাকে ও অপরাধের ফল স্বরূপ ভক্তিতে উন্নতি হচ্ছে না বলে জানা যায়, তাহলে নিরন্তর নাম কীর্তন করা উচিত। সেই রূপ নাম কীর্তন দ্বারা ভক্তিতে নিষ্ঠালাভ হয় এবং এই ভাবে ক্রমশ তার সকল অপরাধের উপশম হয়ে তাকে। যদি জ্ঞাতসারে অপরাধ হয়ে থাকে তবে সেই অপরাধ দূর করার জন্য অন্য উপায় আছে।

## বৈষ্ণব এবং গুরু অপরাধ ঃ-

দশবিধ নাম অপরাধের মধ্যে প্রথম অপরাধ হচ্ছে সাধু নিন্দা। নিন্দা শব্দে দ্বেষ, দ্রোহাদি বুঝায়। যদি অকস্মাৎ এরূপ অপরাধ হয়ে যায় তবে সেই ব্যক্তিকে অনুতাপ করতে হবে। "হায়! হায়! আমি কি নিকৃষ্ট, পামর, আমি একজন সাধুর প্রতি অপরাধ করলাম।"

'অগ্নি দগ্ধ ব্যক্তি অগ্নির দ্বারাই শান্তি লাভ করে থাকে'–এই ন্যায়ানুসারে অনুতপ্ত হয়ে সেই বৈষ্ণব চরণে প্রণাম, স্তুতি ও সম্মান প্রদানের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করে অপরাধের উপশম করা উচিৎ। যদি এই সব করা সত্ত্বেও সেই বৈষ্ণব অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে সেই ব্যক্তিকে অনুকুল ভাবে বৈষ্ণবের ইচ্ছানুযায়ী বহুদিন যাবৎ তার সেবা করতে হবে। কোন কোন সময় অপরাধ এত গুরুতর হয়ে যায় যে, বৈষ্ণবের ক্রোধ প্রশমিত হয় না। তখন অপরাধীকে



অত্যন্ত বিষন্নমনা হয়ে, নিজেকে অত্যন্ত হতভাগা এবং অপরাধের জন্য কোটি কোটি বছর নরকে গতি হবে মনে করে সবকিছু পরিত্যাগ করা উচিত এবং সম্পূর্ণরূপে নাম সংকীর্তনের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। যথা সময়ে নাম কীর্তনের দিব্য শক্তি সেই ব্যক্তিকে উদ্ধার করবে।

পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে,–

**"নাম অপরাধ যুক্তানাং নামানী ত্রব হরন্তি অঘম্"** (ব্রহ্মকান্ড ২৫/২৩)

ভগবানের দিব্য নামই অপরাধীর সমস্ত পাপ হরণ করে। তাকে উদ্ধার করার জন্য সেটাই যথেষ্ট। পদ্ম পুরাণের এই যুক্তিকে প্রয়োগ করে কেউ যেন মনে না করে যে "আমি শুদ্ধ হওয়ার পরম উপায় স্বরূপ শ্রীনামের আশ্রয় নেব। আমার যার প্রতি অপরাধ হয়েছে, বিনয়ী হয়ে তার সেবা ও সম্মান করার কি প্রয়োজন আছে?' এই প্রকার মনোবৃত্তি তার অপরাধের দোষ বর্ধিত করে থাকে। অর্থাৎ পূর্বের ন্যায় নাম অপরাধ জাত হবে।

এরূপ মনে করা উচিৎ নয় যে, সাধু নিন্দা বৈষ্ণবদের বিভিন্ন স্তর অনুসারে বা জাতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এমন নয় যে, যে বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে সাধুর সমস্ত গুণ বা লক্ষণ যুক্ত তাঁর প্রতি অপরাধ করাই অপরাধ। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে সাধুর সদ্ গুণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে–

**কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহীনাম্।**
**সত্যসারোহনবদ্যাত্মাসমঃ সর্ব্বোপকারকঃ।।**

হে উদ্ধব! একজন সাধু হচ্ছেন, কৃপালু এবং তিনি কখনো অপরের হানি বা ক্ষতি করেন না। এমনকি অপর ব্যক্তি তার প্রতি দ্রোহ করলেও তিনি তা সহ্য করেন। তিনি সকল জীবের প্রতি ক্ষমাশীল। তাঁর শক্তি এবং জীবনের মূল্যবোধ সত্য থেকেই জাত হয়ে থাকে, তিনি সমস্ত হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত এবং তাঁর মন জড় জাগতিক সুখ দুঃখের প্রতি সমভাবাপন্ন। এই

ভাবে তিনি অপরের মঙ্গলের জন্য কর্ম করতে তাঁর সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করেন।
(ভাঃ ১১/১১/২৯)

অর্থাৎ যিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহাদি গুণ যুক্ত বৈষ্ণব, শুধুমাত্র তাঁর নিন্দা করলেই বৈষ্ণব অপরাধ হয়, এরূপ বলা যায় না। কেননা পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে–

**সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকা।**

এমনকি যদি কোন সদাচার বিবর্জিত, দুশ্চরিত্রবান, প্রবঞ্চক, অসংস্কৃত, পতিত ব্যক্তিও ভগবানের শরণাপন্ন হয় বা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাকে অবশ্যই সাধু বলে জানবে। (ব্রহ্মখণ্ড ২৫/৯-১০)

এই কথানুসারে কেউ কোন ভক্তের মধ্যে কোন প্রকার দোষ দেখিয়ে তার নিজকৃত অপরাধের লাঘব করতে পারেন না।

কোন সময় দেখা যায় মহাভাগবতের প্রতি গুরুতর অপরাধ করলেও মহানুভবতার দরুন তিনি ক্রোধান্বীত হন না। তবুও অপরাধী সেই ভক্তের চরণে প্রণামাদি করে নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য সেই ভক্তের আনন্দ বিধানের উপায় অবলম্বন করবে। যদিও বৈষ্ণব সেই অপরাধ মার্জন করে থাকে কিন্তু তাঁর চরণ-রেণু সেই অপরাধ সহ্য করেন না এবং দোষী ব্যক্তিকে তার অপরাধের ফল প্রদান করে থাকে। ভাগবতে বলা হয়েছে–

**সের্ষং মহাপুরুষ পাদপাংশুভির্নিরস্ত তেজঃসু তদেব শোভনম্।।**

যারা উন্নত মহাপুরুষদের প্রতি অসূয়াগ্রস্থ হন, তারা সেই মহাপুরুষদের চরণ কমলের ধূলির দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হন। দুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এটাই শোভনীয়।

যাই হোক, এই সকল শক্তিশালী, স্বাভাবিক, সাধারণ নিয়মগুলি অত্যন্ত উন্নত মহাভাগবতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কোন কোন সময়ে দেখা যায়



স্বতন্ত্র স্বভাবযুক্ত মহাভাগবতগণ বিনা কারণেও কৃপাদৃষ্টি প্রদান করে থাকেন। কৃচিৎ মানুষ, তাঁদের অসাধারণ কৃপায় কৃতার্থ হয়ে থাকে। এই রূপ ব্যক্তিদের প্রতি অধিক মর্যাদা প্রদান করলেও তা যথেষ্ট হবে না। এই মহাভাগবতরা কোন কোন সময়ে অত্যন্ত অযোগ্য ও অপরাধীকেও অসীম কৃপা দান করে থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ–

(১) মহারাজ রহুগণ জড় ভরতকে তার পালকি বহনে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি প্রচুর রুক্ষ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, তা সত্ত্বেও জড় ভরত সেই রাজা রহুগণের প্রতি কৃপা করেছিলেন।

(২) সেই ভাবে পাষণ্ড মতাবলম্বী দৈত্যগণ হিংসা করতে উদ্যত হলেও চেদিরাজ উপরিচর বসু তাদের প্রতি কৃপা করেছিলেন।

(৩) মহাপাপিষ্ঠ মাধাই পরম করুণাময় নিত্যানন্দ প্রভুর ললাটে রক্তপাত করেও কৃপা লাভ করেছিলেন।

এখানে প্রথম অপরাধ 'সাধুগণের নিন্দা' বিষয়ে যেরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তৃতীয় অপরাধ **'শ্রীগুরু অবজ্ঞা'** সম্বন্ধেও সেরূপ জানতে হবে।

**বিষ্ণু, শিব এবং দেবতাদের স্থিতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ঃ-**

এখন আমরা দ্বিতীয় অপরাধ, শ্রীবিষ্ণু থেকে শ্রীশিব আদি দেবতাদের নাম, রূপ প্রভৃতির ভেদ চিন্তন সম্বন্ধে বিচার করব।

চৈতন্য দুই প্রকার, যথা ঃ- স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। তার মধ্যে সর্বব্যাপক ঈশ্বর নামক চৈতন্য হচ্ছে স্বতন্ত্র চৈতন্য এবং অস্বতন্ত্র চৈতন্য হচ্ছে ভগবানের শক্তি বিশিষ্ট চিন্মাত্রা যা জীবের শরীরে ব্যপ্ত থাকে। ঈশ্বর চৈতন্য পুনশ্চঃ-দুই প্রকারঃ- একটি মায়া স্পর্শ রহিত এবং অপরটি ঈশ্বরের লীলার জন্য মায়া স্পর্শযুক্ত। প্রথম প্রকার অর্থাৎ মায়াস্পর্শ শূন্য ঈশ্বর, হরি ও নারায়ণ নামে পরিচিত হয়ে

থাকেন। যেভাবে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

**হরির্হিনির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।**
**স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নিগুর্ণো ভবেৎ।।**

বাস্তবে শ্রীহরিই পরম পুরুষ ভগবান, যিনি জড়াপ্রকৃতির অতীত এবং জড় গুণের দ্বারা স্পর্শ রহিত অর্থাৎ নির্গুণ, তিনি সর্বদ্রষ্টা নিত্য সাক্ষী। যে তাঁর উপাসনা করে বা ভজনা করে, সেও জড় গুণ থেকে মুক্ত হয়ে নির্গুণ হয়।"
(ভাঃ ১০/৮৮/৫)

দ্বিতীয় শ্রেণীর ঈশ্বর চৈতন্য শিবাদি নামে পরিচিত, যিনি লীলায় মায়া স্পর্শ স্বীকার করেছেন—

**"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত।।"**

"শিব নিত্য তাঁর স্বশক্তি স্বংযুক্ত এবং স্বেচ্ছায় তিনি গুণ যুক্ত হন বা ত্রিগুণ গ্রহণ করেন এবং গুণের দ্বারা আবৃত্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন।" (ভাঃ ১০/৮৮/৩)

শিব গুণের দ্বারা আবৃত এই রূপ মনে হয় বলে তাকে জীব বলে মনে করা উচিত নয়। ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে—

**ক্ষীরং যথা দধি-বিকার-বিশেষ-যোগাৎ সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।**
**যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।**

দুগ্ধ যেমন বিকারজনক দ্রব্য অম্লাদি সংযোগে দধিরূপে পরিণত হয়, তদ্রুপ কার্যবশতঃ যিনি শম্ভুরূপ ধারণ করেন, মূলতত্ত্বে কারণ হাওয়ায় পৃথক ন'ন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। (৫/৪৫)

অন্যত্র বহু পুরাণ আগমাদিতেও শ্রীশিবের ঈশ্বরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—



**সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।**
**স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞা শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃনাং স্যুঃ।।**

পরমেশ্বর ভগবান সত্ত্ব, রজ এবং তম নামক জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত। জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিনটি গুণজাত রূপ ধারণ করেন। এই তিনটি রূপের মধ্যে, সমস্ত মানুষই সত্ত্বগুণজাত রূপ বিষ্ণুর থেকে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করতে পারেন। (ভাঃ ১/২/২৩)

এই শ্লোক থেকে ব্রহ্মাকেও ঈশ্বর বলে মনে হতে পারে কিন্তু ব্রহ্মার এই ঈশ্বরত্ব কোন জীবের প্রতি ভগবানের আবেশ বশত হয়ে থাকে। (ঈশ্বর আবেশ) ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

**ভাস্বান যথাশ্মসকলেষু তেজঃ-স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যাপি তদ্বদত্র।**
**ব্রহ্মা য এষ জগদন্ড বিধানকর্ত্তা গোবিন্দামাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।**
(৫/৪৯)

সূর্য যেমন সূর্যকান্ত মনি সমূহে স্বীয় কিঞ্চিৎ তেজ প্রকটিত করে তাকে প্রদীপ্ত করে, তদ্রুপ যিনি ব্রহ্মাণ্ড বিধান কর্তা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি শক্তি প্রদান করেন, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি।

**পার্থিবাদ্দারুনো ধূমস্তস্মাদগ্নি স্ত্রয়ীময়ঃ।**
**তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্।।**
(ভাঃ ১/২/২৪)

মাটি বিকার প্রাপ্ত হয়ে দারু হয় অর্থাৎ কাষ্ঠ মৃত্তিকার বিকার বা পরিনাম। কিন্তু ধূম দারু থেকে শ্রেষ্ঠ, অগ্নি ধূম থেকেও উৎকৃষ্ট, যেহেতু অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। সেই ভাবে তমোগুণ থেকে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সত্ত্ব গুণ সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু এর দ্বারা পরম সত্যকে উপলব্ধি করা যায়।

যেভাবে ধূম দারু থেকে শ্রেষ্ঠ, ঠিক সেভাবেই রজোগুণ তমোগুণ থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ধূমের মধ্যে তেজোময় অগ্নিকে উপলব্ধি করা যায় না সেইরূপ ধূম স্থানীয় রজোগুণের মধ্যে শুদ্ধ তেজোময় ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না। অগ্নিরূপ সত্ত্বগুণে শুদ্ধ তেজস্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। যেভাবে কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি বর্তমান থাকে, যদিও অগ্নিকে কাঠের মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। ঠিক সেভাবেই ভগবান অদৃশ্যভাবে তমোগুণের মধ্যেও আছেন। ঠিক যেভাবে তমোগুণের লক্ষণ স্বরূপ সুষুপ্তিতে (গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রা কালে) যে সুখের অনুভব হয়, সেই সুখ ঠিক ভগবানের নিরাকার বা নির্বিশেষ স্বরূপের অনুভব থেকে লব্ধ সুখের ন্যায় (নির্ভেদ-জ্ঞান সুখ)। এইভাবে বিচার করে তত্ত্ব নির্ণয় করা দরকার।

ভগবানের অধীন চৈতন্য জীব তার অবস্থা ভেদে দুই প্রকার ঃ- (১) অবিদ্যার দ্বারা অনাবৃত এবং (২) অবিদ্যার দ্বারা আবৃত। দেব-মনুষ্য ও পশুরা আবৃত চৈতন্য বিশিষ্ট জীব।

**অনাবৃত চৈতন্য বিশিষ্ট জীব দুই প্রকার** ঃ- (১) ঈশ্বরের ঐশ্বর্য শক্তির দ্বারা অবিষ্ট (২) ঐশ্বর্য শক্তির দ্বারা অনাবিষ্ট।

ঐ অনাবিষ্ট চৈতন্য বিশিষ্ট জীব আবার দুপ্রকার ঃ- (১) জ্ঞান অভ্যাস দ্বারা যারা ঈশ্বরে লীন হন। এদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং (২) যারা ভক্তি অনুশীলন দ্বারা ভগবান থেকে স্বতন্ত্র সত্তা যুক্ত হয়ে তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করেন এরাই প্রকৃত সুখী।

ঐশ্বর্য শক্তি দ্বারা আবিষ্ট চৈতন্য বিশিষ্ট জীবও দুই প্রকার ঃ- (১) চিদ্ অংশ জ্ঞানাদি ঐশ্বর্যশক্তি আবিষ্ট অর্থাৎ চিন্ময় জ্ঞানে মগ্ন। যেমন চতুঃকুমার গণ

(২) মায়াংশে ভূত সৃষ্টাদি ঐশ্বর্য শক্তি দ্বারা আবিষ্ট অর্থাৎ যারা জড়ীয় সৃষ্টাদি কর্মে মগ্ন—যেমন ব্রহ্মা ও দেবতাগণ।

কেউ হয়ত মনে করতে পারে যে, বিষ্ণু এবং শিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যেহেতু উভয়ই হচ্ছে একই, ঈশ্বর চৈতন্য। তবুও নিষ্কাম ভক্তগণ সগুণ ও নির্গুণ ভিত্তিতে কে উপাস্য বা কে উপাস্য নয়, তা নির্ণয় করে থাকেন। নির্গুণ



অর্থাৎ কোন প্রকার জড়-গুণ-রহিত-যেমন বিষ্ণু। দুই প্রকার ভিন্ন চৈতন্য বিশিষ্ট হওয়ার দরুণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পার্থক্য সুস্পষ্ট। যারা এ বিষয়গুলি ঠিকমত পর্যালোচনা করে নাই, তারা "বিষ্ণুই ঈশ্বর' শিব ঈশ্বর নন। শিবই ঈশ্বর, বিষ্ণু ঈশ্বর নন। আমরা বিষ্ণুর ভক্ত, শিবকে দেখব না; আমরা শিবের ভক্ত, বিষ্ণুকে দেখব না"। এরূপ বিবাদগ্রস্থ হয়ে অপরাধ করে থাকে, যা দ্বিতীয় নামাপরাধ। কোনোভাবে যদি এই প্রকার অপরাধীদের সাধুসঙ্গ ঘটে এবং ঐ সাধু কর্তৃক এই ব্যাপারে অর্থাৎ কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে শিব এবং ভগবান বিষ্ণু অভিন্ন তত্ত্ব তা বুঝতে পারে তখন নাম কীর্তনের দ্বারা ঐ অপারেধর ক্ষয় হয়।

চৈতন্যের বিভিন্ন বিভাগ

**বৈদিকশাস্ত্রের নিন্দা করা ঃ-** যেহেতু কোন শ্রুতি শাস্ত্র কখনও কখনও ভক্তিকে ইঙ্গিত করে না, সুতরাং এই শ্রুতিগুলি বহির্মুখ, অতএব নিন্দিত। এরূপ মনে করা হচ্ছে শাস্ত্র নিন্দা। যে মুখে কর্ম, জ্ঞান প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহের নিন্দা করা হয়, সেই মুখে শ্রুতি সমূহ এবং সেই শাস্ত্রের অনুশীলনকারী কর্মী ও জ্ঞানীদের বারংবার প্রশংসা করে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন করলে শাস্ত্র নিন্দারূপ চতুর্থ নাম অপরাধ খন্তন হয়ে থাকে। কোন বিজ্ঞ ভক্তের কাছ থেকে এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করার সৌভাগ্য হলেই অপরাধের নিস্তার হয়। স্বেচ্ছাচারী, জড় বিষয় বাসনায় অন্ধ ও ভক্তি মার্গ অনুশীলনে অনধিকারী ব্যক্তিগণকে শ্রুতি অত্যন্ত কৃপা পূর্বক শাস্ত্র নির্দেশিত পথে আনার জন্য চেষ্টা করে। অনুরূপ ভাবে অন্য ছয় প্রকার নাম অপরাধের উদ্ভব ও নিবৃত্তির কারণ সমূহ জানতে হবে।

**ভক্ত্যুথ অনর্থ ঃ-** ভক্ত্যুথ অনর্থ অর্থাৎ ভক্তি থেকে জাত অনর্থ। যেভাবে মূল শাখা থেকে উপশাখার সৃষ্টি হয়, ঠিক সেভাবেই ভক্তিরূপ মূল শাখা থেকে ধন, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি উপশাখার আবির্ভাব হয়। বা মূখ্য গাছের সাথে বহু আগাছা বাড়তে থাকে। সেই রূপ ভক্তি লতার সাথে সাথে ধন, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি বহু আগাছার আবির্ভাব হয়। এই আগাছাগুলি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং তাদের প্রভাব ভক্তের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। মূল ভক্তি লতার বৃদ্ধিকে স্তব্ধ করে রাখে।

## অনর্থ নিবৃত্তি ঃ

চার প্রকার অনর্থের মধ্যে প্রতিটি অনর্থ নিবৃত্তির পাঁচটি স্তর আছে। সেগুলি হল–

(১) **একদেশবর্ত্তিনী–** যখন অনর্থ অল্প অংশ বা কীয়ৎ পরিমাণে নাশ হয়ে থাকে (৫ শতাংশ–১৫ শতাংশ)।



(২) **বহুদেশবর্ত্তিনী**–যখন অনর্থ বাহুল্যাংশে নাশ হয়ে থাকে (৭৫ শতাংশ)।

(৩) **প্রায়িকী**–যখন প্রায় সব অনর্থ নাশ হয়ে থাকে। অতি অল্প অবশিষ্ট থাকে (৯৫ শতাংশ)।

(৪) **পূর্ণা অনর্থ নিবৃত্তি**–অনর্থের সম্পূর্ণ নাশ অর্থাৎ কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। একশ শতাংশই নিবৃত্তি। এইস্তরে সম্পূর্ণরূপে অনর্থের নাশ হয়ে থাকে সত্য, কিন্তু পূণরায় অনর্থের উদ্‌গমের সম্ভাবনা থাকে।

(৫) **আত্যন্তিকী অনর্থ নিবৃত্তি ঃ**–যখন সম্পূর্ণরূপে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে যায় এবং পূণর্বার অনর্থের উদ্‌গম হওয়ার সম্ভবনা থাকে না, তখন তাকে আত্যন্তিক অনর্থ নিবৃত্তি বলা হয়।

অপরাধোত্থ নিবৃত্তি–"**গ্রামোদগ্ধ পটভগ্ন ঃ**– গ্রাম দগ্ধ হয়েছে, পট ভগ্ন হয়েছে। এই ন্যায় অনুসারে ভজন ক্রিয়ার প্রারম্ভ থেকে কীয়ৎ পরিমাণে বা স্বল্পাংশে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে থাকে। যখন ভক্তি অনুশীলন নিষ্ঠার স্তরে পৌছায় তখন অনর্থের বহুদেশ বর্ত্তিনী নিবৃত্তি হয়। রতি বা ভাবের আবির্ভাবে অনর্থের প্রায়িকী নিবৃত্তি হয়। প্রেমের উদয় হলে অনর্থের পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। ভগবানের সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভের ফলে আত্যন্তিক অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে থাকে। অর্থাৎ অনর্থের পুনরোদ্‌গমের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। তা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনাবলী থেকে কেউ মনে করতে পারেন যে, শ্রীভগবানের চরণকমল প্রাপ্ত হওয়ার পরেও অনর্থের পুনরোদগমের সম্ভবনা থাকে; কিন্তু এই প্রকার ধারণা মনে থেকে বুদ্ধির দ্বারা দুর করা উচিৎ।

চিত্রকেতু ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করেছিলেন। শিবের প্রতি তার তৎকালীক মহা অপরাধ প্রাতীতিক মাত্র। এটি বাস্তব নয়। যেহেতু তার এই ত্রুটি থেকে কোন খারাপ ফল দেখা যায় না। ভগবানের পার্ষদরূপে এবং বৃত্রাসুর রূপে উভয় ক্ষেত্রেই চিত্রকেতুর মধ্যে ভগবৎ- প্রেম সম্পদ বিদ্যমান ছিল।

জয় ও বিজয়ের প্রাতীতিক অপরাধ প্রেমের দ্বারা উদ্দীপিত বা প্ররোচিত হয়ে স্বেচ্ছায় হয়েছিল। তারা দুজন এভাবে ইচ্ছা করেছিলেন, "হে প্রভু! হে দেবাদিদেব

নারায়ণ! আপনি যুদ্ধ করার আনন্দ উপভোগ করতে ইচ্ছা করছেন। কিন্তু আমরা ব্যতীরেকে অন্য সবাই আপনাকে প্রতিরোধ করার জন্য অত্যন্ত দুর্বল। অন্যত্রও বলবান কাউকে দেখছিনা। যদিও আমরা বলবান, আমরা আপনার প্রতিকূল নই। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে আপনার প্রতি শত্রুভাব নেই। অতএব কোন ভাবে আমাদেরকে আপনার বিরোধী ভাবাপন্ন করিয়ে আপনি যুদ্ধ রসের আনন্দ উপভোগ করুন। আপনার স্বতঃ পূর্ণতা বিন্দুমাত্র কম হোক, তা আমরা সহ্য করতে পারি না। অতএব আপনার ভক্ত বাৎসল্যতাকে লঘু করেও আপনার কিঙ্কর আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

**দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ নিবৃত্তি ঃ–** দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ সমূহের ভজন ক্রিয়ার পর প্রায়িকী নিবৃত্তি হয়। নিষ্ঠার উৎপত্তি হলে পূর্ণ নিবৃত্তি। আসক্তির উদয় হলে আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়।

**ভক্ত্যুত্থ অনর্থ নিবৃত্তি ঃ–** ভক্তি থেকে জাত অনর্থ সমূহের ভজন ক্রিয়ার পর একদেশবর্ত্তিনী নিবৃত্তি হয়। নিষ্ঠার উৎপত্তি হলে পূর্ণ নিবৃত্তি ও রুচি জাত হলে আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়ে থাকে। বিষয় বস্তুর উপর সম্পূর্ণ বিচার করার পর অনুভবী মহৎ ব্যক্তিগণ এরূপ স্থির করেছেন।

| সাধন-ভজনের বিভিন্ন অবস্থা | সুকৃতোত্থ / দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ | ভক্ত্যুত্থ অনর্থ | অপরাধোত্থ অনর্থ |
|---|---|---|---|
| ভজনক্রিয়া | 'প্রায়িকী' | 'একদেশবর্ত্তিনী' | 'একদেশবর্ত্তিনী' |
| নিষ্ঠা | 'পূর্ণা' | 'পূর্ণা' | 'বহুদেশবর্ত্তিনী' |
| রুচি | " | 'আত্যন্তিকী' | " |
| আসক্তি | 'আত্যন্তিকী' | – | " |
| ভাব/রতি | – | – | 'প্রায়িকী' |
| প্রেম | – | – | 'পূর্ণা' |
| ভগবৎপদ প্রাপ্তি | – | – | 'আত্যন্তিকী' |



শাস্ত্রে বর্ণিত শত শত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে কেউ হয়ত বলতে পারে যে, এরূপ অনর্থ নিবৃত্তির স্তরগুলি ভক্তদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। যেমন–

**অংহঃসংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।**
**তরণিরিব তিমির জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।।**
(শ্রীধর স্বামী পদ্যাবলী ১৬)

সূর্য যেভাবে উদিত হওয়া মাত্রই বিশ্বের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়ে থাকে, সেই রূপ শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করা মাত্রই পাপ বিনষ্ট হয়ে থাকে। সারা জগতের মঙ্গল বর্ধনকারী শ্রীহরির দিব্যনামের জয় হোক।

**ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়।**
**যন্নামাসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।।**

হে ভগবান! কেবলমাত্র আপনার দর্শন দ্বারাই যে সমস্ত জড় কলুষ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হবে এতে কোন সন্দেহ নাই। আপনার দর্শনের কথা কি বলব, আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করলে এমনকি চণ্ডাল পর্যন্ত সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

কিংবা অজামিলের দৃষ্টান্ত–যেখানে তার একবার ভগবৎ নাম উচ্চারণের ফলে নামাভাসের দ্বারা সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হয়েছিল। এমনকি সমস্ত সংসার বন্ধনের কারণ স্বরূপ অবিদ্যা পর্যন্ত দূরীভূত হয়েছিল। ফলতঃ সে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করেছিল।

একথা সত্য; কারণ ভগবানের দিব্য নাম যে অপরিসীম শক্তি আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দিব্যনাম অপরাধী-ব্যক্তির প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে তার পূর্ণ শক্তি প্রকাশ করেন না। এটি হচ্ছে বাস্তব কারণ, যার জন্য অপরাধীর মনে পাপ বাসনার অস্তিত্ব থেকে যায়। তা সত্ত্বেও যমদূতেরা এরূপ ব্যক্তিকেও আক্রমন করতে অক্ষম। যেরূপ অজামিলের ক্ষেত্রে হয়েছিল–

নারায়ণ! আপনি যুদ্ধ করার আনন্দ উপভোগ করতে ইচ্ছা করছেন। কিন্তু আমরা ব্যতীরেকে অন্য সবাই আপনাকে প্রতিরোধ করার জন্য অত্যন্ত দুর্বল। অন্যত্রও বলবান কাউকে দেখছিনা। যদিও আমরা বলবান, আমরা আপনার প্রতিকূল নই। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে আপনার প্রতি শত্রুভাব নেই। অতএব কোন ভাবে আমাদেরকে আপনার বিরোধী ভাবাপন্ন করিয়ে আপনি যুদ্ধ রসের আনন্দ উপভোগ করুন। আপনার স্বতঃ পূর্ণতা বিন্দুমাত্র কম হোক, তা আমরা সহ্য করতে পারি না। অতএব আপনার ভক্ত বাৎসল্যতাকে লঘু করেও আপনার কিঙ্কর আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

**দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ নিবৃত্তি ঃ–** দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ সমূহের ভজন ক্রিয়ার পর প্রায়িকী নিবৃত্তি হয়। নিষ্ঠার উৎপত্তি হলে পূর্ণ নিবৃত্তি। আসক্তির উদয় হলে আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়।

**ভক্ত্যুত্থ অনর্থ নিবৃত্তি ঃ–** ভক্তি থেকে জাত অনর্থ সমূহের ভজন ক্রিয়ার পর একদেশবর্ত্তিনী নিবৃত্তি হয়। নিষ্ঠার উৎপত্তি হলে পূর্ণ নিবৃত্তি ও রুচি জাত হলে আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়ে থাকে। বিষয় বস্তুর উপর সম্পূর্ণ বিচার করার পর অনুভবী মহৎ ব্যক্তিগণ এরূপ স্থির করেছেন।

| সাধন-ভজনের বিভিন্ন অবস্থা | সুকৃতোত্থ / দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ | ভক্ত্যুত্থ অনর্থ | অপরাধোত্থ অনর্থ |
|---|---|---|---|
| ভজনক্রিয়া | 'প্রায়িকী' | 'একদেশবর্ত্তিনী' | 'একদেশবর্ত্তিনী' |
| নিষ্ঠা | 'পূর্ণা' | 'পূর্ণা' | 'বহুদেশবর্ত্তিণী' |
| রুচি | " | 'আত্যন্তিকী' | " |
| আসক্তি | 'আত্যন্তিকী' | – | " |
| ভাব/রতি | – | – | 'প্রায়িকী' |
| প্রেম | – | – | 'পূর্ণা' |
| ভগবৎপদ প্রাপ্তি | – | – | 'আত্যন্তিকী' |



শাস্ত্রে বর্ণিত শত শত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে কেউ হয়ত বলতে পারে যে, এরূপ অনর্থ নিবৃত্তির স্তরগুলি ভক্তদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। যেমন–

**অংহঃসংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।**
**তরণিরিব তিমির জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরেনার্ম।।**

(শ্রীধর স্বামী পদ্যাবলী ১৬)

সূর্য যেভাবে উদিত হওয়া মাত্রই বিশ্বের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়ে থাকে, সেই রূপ শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করা মাত্রই পাপ বিনষ্ট হয়ে থাকে। সারা জগতের মঙ্গল বর্ধনকারী শ্রীহরির দিব্যনামের জয় হোক।

**ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়।**
**যন্নামাসকৃচ্ছ্র বণাৎ পুক্কশোহপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।।**

হে ভগবান! কেবলমাত্র আপনার দর্শন দ্বারাই যে সমস্ত জড় কলুষ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হবে এতে কোন সন্দেহ নাই। আপনার দর্শনের কথা কি বলব, আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করলে এমনকি চণ্ডাল পর্যন্ত সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

কিংবা অজামিলের দৃষ্টান্ত–যেখানে তার একবার ভগবৎ নাম উচ্চারণের ফলে নামাভাসের দ্বারা সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হয়েছিল। এমনকি সমস্ত সংসার বন্ধনের কারণ স্বরূপ অবিদ্যা পর্যন্ত দূরীভূত হয়েছিল। ফলতঃ সে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করেছিল।

একথা সত্য; কারণ ভগবানের দিব্য নাম যে অপরিসীম শক্তি আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দিব্যনাম অপরাধী-ব্যক্তির প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে তার পূর্ণ শক্তি প্রকাশ করেন না। এটি হচ্ছে বাস্তব কারণ, যার জন্য অপরাধীর মনে পাপ বাসনার অস্তিত্ব থেকে যায়। তা সত্ত্বেও যমদূতেরা এরূপ ব্যক্তিকেও আক্রমন করতে অক্ষম। যেরূপ অজামিলের ক্ষেত্রে হয়েছিল–

**"সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং-তদগুণরাগি যৈরিহ।**
**ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান স্বপ্নেহপি পশ্যন্তি হি চীর্ন নিষ্কৃতাঃ।।**

শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করলেও যারা অন্ততঃ একবার তাঁর শ্রী পাদপদ্মে শরণাগত হয়েছেন এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ ও লীলর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তারা সম্পূর্ণ রূপে পাপ থেকে মুক্ত। সেই শরণাগত ব্যক্তি স্বপ্নেও পাপীদের বন্ধন করার জন্য পাশ-ধারী যমদূতদের দর্শন করেন না। (ভাঃ ৬/১/১৯)

যদিও এটি সত্য যে, নাম অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া ব্যতিরেকে তাদের শুদ্ধ হওয়ার অন্য কোন উপায় নাই। পদ্ম পুরাণে দশটি নাম অপরাধের আলোচনায় বলা হয়েছে ঃ- **"নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধি।"**
(পদ্ম পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ২৫/১৬)

যাঁরা নাম বলে পাপ কর্ম করে তারা হাজার হাজার বৎসর যম, নিয়মাদি, যোগ প্রণালী অভ্যাস করলেও শুদ্ধ হতে পারবে না।

এই শ্লোকে উল্লেখিত 'যম' শব্দের অর্থ হচ্ছে যোগ শাস্ত্রে যম, নিয়মাদির বিধি বিধান। অপরপক্ষে যদিও অপরাধী মৃত্যুর দেবতা যমরাজ থেকে রেহাই পায়, কিন্তু যম বা শুদ্ধ হওয়ার অন্য কোন উপায়ই তাকে অনর্থ থেকে মুক্ত করতে পারে না।

অপরাধীর নামের কৃপা থেকে বঞ্চিত হওয়া ব্যাপারটি ঠিক যেমন কোনো অধীনস্থ ব্যক্তি তার বহু সম্পদশালী ও ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো প্রভুর প্রতি অপরাধ করায় প্রভু তার প্রতি উদাসীন ভাবে ব্যবহার করেন এবং তাকে আর যত্ন করেন না। ফলে সেই সেবকটি সমস্ত প্রকার দুঃখ দুর্দশা ভোগ করে। এটি জানা উচিত যে প্রত্যেকের প্রভু (কর্ম, জ্ঞান, যোগ) তার অপরাধী ভৃত্যের প্রতি অবহেলা করে থাকেন। যদি সেই অপরাধী সেবকটি পুণর্বার নিজেকে তার প্রভুর আজ্ঞাধীন করায়, তখন ক্রমশ প্রভু তার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন এবং সেই লোকটির দুঃখ



দুর্দশা ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হয়ে যায়। ঠিক সেভাবেই অপরাধী ভক্ত প্রথমে কিছু দুঃখ ভোগ করে। যখন সে পুণর্বার নিষ্ঠা সহকারে সাধু, গুরু, শাস্ত্রের সেবা করে, নাম তার প্রতি ক্রমে ক্রমে কৃপা প্রকাশ করে থাকেন এবং তার সমস্ত কলুষিত প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়ে যায়। এবিষয়ে আর কোন বিবাদ বা মতভেদ দেখা যায় না।

কেউ হয়ত যুক্তি উত্থাপন করতে পারে যে, সে কখনো অপরাধ করে নাই, তাহলে সে কেন শ্রীনামের পূর্ণ কৃপা লাভ করছে না। তার এরূপ মন্তব্য করা উচিত নয়, কেননা অধুনা সে হয়ত কোন অপরাধ করে নাই কিন্তু পূর্বে কখনো কোন অপরাধ করে থাকতে পারে। সুতরাং তার মধ্যে যে অপরাধ ছিল, সেটি তার বর্তমান ফলের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে। কোনো অপরাধ থাকলে ফলস্বরূপ সেই লোকের মধ্যে নাম কীর্তন করার সময়ে প্রেমের কোন লক্ষণ দেখা যাবে না। যেভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে ঃ-

**তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।**
**ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।**

হরিনাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যার নেত্রে প্রেমাশ্রু, দেহে রোমাঞ্চ ও হৃদয়ে বিক্রিয়া প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার দেখা যায় না, তার হৃদয় অবশ্যই লোহার আবরণে আচ্ছাদিত। (ভাঃ ২/৩/২৪)

অপরাধ সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত একটি শ্লোক থেকে আর এক প্রকার সন্দেহের উদয় হয়ে থাকে।

**"কে তেহপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ।**
**বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি হি।।"**

"হে বিপ্রেন্দ্র! ভগবানের নামের প্রতি যে সকল অপরাধ জীবনের সুকৃতিকে নাশ করে এবং চিন্ময় অপ্রাকৃত বিষয়ে প্রাকৃত বুদ্ধি বা ধারণ জন্মায়, সেগুলি কি কি? (পদ্মপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ২৫/১৪)

বারংবার ভগবানের নাম, গুণাদির কীর্তন প্রেম প্রদান করে থাকে। পবিত্র ধামাদির সেবা জীবনের সিদ্ধি প্রদান করে এবং দুগ্ধ, তাম্বুলাদি ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা বিনষ্ট করে। তাহলে যার ফলে এই সব ভজনের ফল প্রাপ্তি প্রতিহত হয় এবং এই সমস্ত দ্রব্য পরম চিন্ময় স্বরূপ সত্ত্বেও প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়! সেই গুরুতর অপরাধ গুলি কি? এরূপ অত্যন্ত চমৎপ্রদ ও বিস্ময় জনক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে।

যদি এরূপ হয়, তাহলে যে নাম অপরাধ করে, সে কি ভগবৎ বিদ্বেষী হয়ে যায়? এবং সে কি গুরুর আশ্রয় লাভ করতে পারে না বা অন্য কোন ভক্তি মূলক সেবা করতে পারে না?

একথা সত্য, ঠিক যেভাবে প্রবল জ্বর হলে লোকে খাদ্যের কোন স্বাদ পায় না। তার পক্ষে কিছু খাওয়া অসম্ভব হয়। সেইরকম যারা গুরুতর অপরাধ করে তাদের শ্রবণ কীর্তন এবং অন্য ভক্তিমূলক সেবা করার অবকাশ থাকে না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন সেই জ্বর সময় মতো প্রশমিত হয় তখন খাদ্যের প্রতি কিছুটা রুচি বাড়ে। তবুও দুধ ও চালের মতো পুষ্টিকর খাদ্যগুলি দীর্ঘস্থায়ী পুরাতন জ্বরে আক্রান্ত লোককে সম্পূর্ণ রূপে পুষ্টি প্রদান করতে পারে না। সেই খাদ্যগুলি কিছুটা উপকার প্রদান করে থাকে। কিন্তু তার ভগ্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে না। তবুও যথাসময়ে ঔষধ, উপযুক্ত পথ্য প্রয়োগে তার পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে আসা সম্ভব। তার পরই কেবল সাধারণ খাদ্যের পূর্ণশক্তি তার শরীর গ্রহণ করতে সমর্থ হবে।

ঠিক সেইভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অপরাধের ফল ভোগ করার পর, তীব্রতার কিছুটা প্রশমন ঘটে এবং তখন ভক্ত সামান্য রুচি লাভ করে। পুনরায় ভক্ত ভক্তি অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বারংবার ভগবানের নাম শ্রবন, কীর্তনাদি রূপ ঔষধ দ্বারা ক্রমশ সব কিছুর নিরাময় ঘটে ও ধীরে ধীরে ভক্তি জীবনে উন্নতি হয়।



সাধুরা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ-

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
তথাসক্তি স্ততো ভবেত্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।"

সাধকের মধ্যে প্রেমের উদয় পর্যন্ত ভক্তি মার্গে প্রগতির ক্রম ঃ- আদিতে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং পরিশেষে প্রেম। (ভঃ রঃ সিঃ ১/৪/১৫-১৬)

কেউ কীর্তনাদি অনুশীলনকারীদের মধ্যে নাম অপরাধের উপস্থিতি কল্পনা করতে পারেন। কারণ তাদের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ দর্শন না করে পাপের প্রবৃত্তিই দর্শন করে। এই প্রকার ভক্তের মধ্যে ভৌতিক দুঃখ-দুর্দশা দেখে তারা মনে করে যে, এই ভক্তের পূর্ব কর্মের ফল (প্রারব্ধ) এখনো পর্যন্ত বিনাশ হয় নাই। ইতি পূর্বে দেখা গিয়েছিল যে অজামিল নিরপরাধে নাম করেছিল। কেননা সে প্রতিদিন তার পুত্রকে (নারায়ণ নামে) বহুবার ডাকার মাধ্যমে ভগবানের নাম গ্রহণ করেছিল। নাম অপরাধ না থাকলেও তার মধ্যে প্রেমের লক্ষণ প্রকাশিত হয় নি এবং সে বেশ্যা সঙ্গাদি পাপ কর্মেও প্রবৃত্ত ছিল।

যুধিষ্ঠির আদি পাণ্ডবগণ স্বয়ং ভগবানের সঙ্গ লাভ করেছিলেন এবং এইভাবে অবশ্যই তারা তাদের সমস্ত পূর্ব কর্মফল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাদেরকে বহু বহু আপাত দুঃখ লাভ করতে হয়েছিল। যেভাবে একটি ফলবান বৃক্ষে যথাসময়ে ফল ধরে, তদ্রুপ ভগবানের নাম নিরপরাধীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকলেও যথাসময়ে তার প্রতি কৃপা প্রকাশ করে থাকেন। ভক্ত তার পূর্ব অভ্যাস বশতঃ যে পাপ করে থাকে, সেটি ক্ষতিকারক নয়, ঠিক যেভাবে বিষদন্তহীন সর্পের দংশন কোন ক্ষতি করে না। ভক্তের রোগ, শোক, দুঃখাদি তার প্রারব্ধ কর্মের দরুন নয়। ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

যস্যাহম অনগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনম শনৈঃ।
ততোহধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখ-দুঃখানাম্।।

যার প্রতি আমি বিশেষ কৃপা করি ক্রমে ক্রমে আমি তার সমস্ত জড় সম্পদ হরণ করি। কপর্দকশূন্য হওয়ার দরুন তার পরিবার এবং আত্মীয় স্বজন তাকে পরিত্যাগ করে এবং এই ভাবে সে একটি পর আর একটি দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে থাকে। (ভাঃ ১০/৮৮/৮)

"নির্ধনত্বামহারোগো মদ্ অনুগ্রহ লক্ষণম্।।"

নির্ধনত্বরূপ মহারোগ আমার অনুগ্রহেরই লক্ষণ। এই ভাবে ভগবান তার ভক্তের মঙ্গলের জন্য, ভক্তের দৈন্য ও উৎকণ্ঠাদি বর্ধনের জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখ দান করে থাকেন। সুতরাং ভক্তের কর্ম ফলের অভাব বশত এই সমস্ত দুঃখাদিকে তার প্রারব্ধ ফল বলা যায় না।

–ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত মাধুর্য্যকাদম্বিনী–গ্রন্থে সর্বগ্রহ প্রশমিনী 'অনর্থ নিবৃত্তি' নামক তৃতীয়-অমৃত-বৃষ্টি।

## চতুর্থ্যমৃতবৃষ্টি ঃ

# নিষ্যন্দ বন্ধুরা (নিষ্ঠা)

পূর্বে যে নিষ্ঠিতা ও অনিষ্ঠিতা এই দু-প্রকার ভজন ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়ার ছটি বিভাগ প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানে নিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা না করেই অনর্থ নিবৃত্তির আলোচনা হয়েছিল। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে ঃ–

"শৃন্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্।।
নষ্টপ্রায়েম্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী।।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবন এবং কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ বাসনা বিনাশ করেন। নিয়মিত ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবন করলে এবং ভগবানের শুদ্ধভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, এবং তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।
(ভাঃ ১/২/১৭-১৮)

উপরে বর্ণিত শ্লোকগুলির মধ্যে প্রথম শ্লোকে "শৃন্বতাং স্বকথা কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ" এই অংশে অনিষ্ঠিতা ভক্তির কথা বলা হয়েছে। নৈষ্ঠিকী ভক্তি পরে উদয় হয় বলে দ্বিতীয় শ্লোকে নিষ্ঠিতা ভক্তির কথা বলা হয়েছে। এই দুই প্রকার উক্তির মধ্যে "অভদ্রানি বিধুনোতি" অমঙ্গলের নাশ করে–এই বাক্য অনর্থ নিবৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

"নষ্ট প্রায়েষ্বভদ্রেষু" অর্থাৎ অভদ্র নষ্ঠ প্রায় এই কথার দ্বারা সূচিত হচ্ছে যে, অনর্থের অল্পাংশ এখনও নিবৃত্তি হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে যথার্থ ক্রম

হচ্ছে অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি এবং তারপর নিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়া। সুতরাং এখন নিষ্ঠিতা ভক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

নিষ্ঠিতা বলতে নিষ্ঠা বা নৈশ্চল্যতা ভাব লাভ করা। প্রত্যহ ভক্তরা এই নিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা করলেও যতক্ষণ অনর্থ থাকবে, ততক্ষণ তারা এটি লাভ করতে পারবে না। অনর্থ দশায় পাঁচটি প্রভাবশালী প্রতিবন্ধক থাকে। সেগুলি হল–লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ।

অনর্থ নিবৃত্তির পর যখন এই সমস্ত প্রতিবন্ধক সমূহের প্রায় লোপ হয় তখন নিষ্ঠা লাভ করা যায়। এই ভাবে এই পাঁচটির অনুপস্থিতিই হচ্ছে নিষ্ঠার লক্ষণ।

(১) **লয়ঃ**- কীর্তন, শ্রবন ও স্মরণকালে উত্তরোত্তর অধিক নিদ্রার প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার নাম 'লয়'।

(২) **বিক্ষেপ ঃ**- শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরনাদি ভক্তিযোগ অনুশীলনের সময়ে গ্রাম্যকথা-বার্তায় বিক্ষিপ্ত হওয়াকে বলে 'বিক্ষেপ'।

(৩) **'অপ্রতিপত্তি'ঃ**- লয় ও বিক্ষেপের অনুপস্থিতিতেও কোন কোন সময়ে সাধকের মধ্যে শ্রবণ, কীর্তনাদি ভক্তি যোগ অনুশীলনে অক্ষমতা।

(৪) **কষায় ঃ**- শ্রবণ, কীর্তন, স্মরনাদি ভজন কালে জন্মগত বা সহজাত ক্রোধ, লোভ, প্রভৃতির আবির্ভাব।

(৫) **রসাস্বাদ ঃ**- জড় সুখের সুযোগ প্রাপ্ত হলে কীর্তনাদি ভগবৎ সেবাতে মনযোগ না থাকা।

এই সমস্ত দোষ মুক্ত হলে নিষ্ঠিতা ভক্তির আবির্ভাব হয়।

**"তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।**
**চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি।।"**

অর্থাৎ, যখন হৃদয়ে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়, তখন রাজো ও তমোগুণের প্রভাবজাত কাম ও লোভাদি হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে যায়। তারপর ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ করে। (ভাঃ ১/২/১৯)

এই শ্লোকে যে 'চ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা সমুদয় অর্থে রজো ও তমোগুণের উপস্থিতিকে বুঝায়। কিন্তু "চেত এতৈরনাবিদ্ধং" বাক্যের দ্বারা



বোঝা যায় যে, যদিও এগুলি ভাব অবস্থা পর্যন্ত স্বল্প মাত্রায় উপস্থিত থাকে, তবুও তা ভক্তিবাধক রূপে কার্য করে না।

নিষ্ঠা দু-প্রকারঃ-(১) সাক্ষাদ্-ভক্তি-বর্তিনী এবং (২) ভক্তি অনুকূল-বস্তু-বর্তিনী

সাক্ষাৎ ভক্তি অনন্ত প্রকার হলেও তার মধ্যে মুখ্যত তিনটি বিভাগ রয়েছে। যথা ঃ- কায়িকী, বাচিকী এবং মানসী। কোনো কোনো ঋষিদের মতে প্রথমে কায়িকী, পরে বাচিকী (কীর্তন) এবং তারপরে মানসী ভক্তিতে (স্মরণ, ধ্যান) নিষ্ঠা লাভ হয়ে থাকে, কিন্তু অন্যরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মতে এইরূপ কোন ক্রম নেই। তারা বলে ভগবানের সেবা করার ব্যগ্রতা ভক্তের সংস্কার বশতঃ স্বভাব অনুসারে এক নির্দিষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। যা তার কায়িকী, বাচিকী এবং মানসী শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, অর্থাৎ সহনশীলতা তেজ ও বলের তারতম্য অনুসারে ভগবৎ উন্মুখতার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

ভক্তির অনুকূল বস্তু গুলি হল অমানিত্ব, মানদত্ব, মৈত্রী ও দয়া। কখনো কখনো ভক্তিকে নিষ্ঠা না থাকলেও শমগুণ সম্পন্ন ভক্তের মধ্যে এই সমস্ত গুণে নিষ্ঠা দেখা যায়। আবার কোথাও কোথাও কোন উদ্ধত ভক্তের ঐ সকল গুণে নিষ্ঠা পরিলক্ষিত না হলেও তার মধ্যে ভক্তির প্রতি নিষ্ঠা থাকে। তথাপি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভক্তিতে নিষ্ঠার অস্তিত্ব বা অভাব দ্বারা নিষ্ঠার বাস্তবিক অস্তিত্ব বা অভাব সম্বন্ধে অবগত হন। কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এভাবে যথার্থ সত্য উপলব্ধি করতে সমর্থ নন।

পূর্বে উল্লেখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকানুসারে এটা নিশ্চিতরূপেই প্রতিপাদিত হয়েছে, "ভক্তির ভবতি নৈষ্ঠিকী" অর্থাৎ নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়ের ফলে ..... "তদা রজস্তমোভাবাঃ চেত ঐতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে" রজগুণ ও তমোগুণজাত কাম ক্রোধের ছিটা ফোঁটা থাকলেও সে গুলির প্রভাব ভক্তকে আর প্রভাবিত করতে পারে না। সার কথা হল শ্রবন কীর্তনাদি ভক্তিমূলক সেবাতে যত্নের শিথিলতা দ্বারা অনিষ্ঠিতা ভক্তির পরিচয়ও প্রবলতার দ্বারা নিষ্ঠিতা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

–ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিত মাধুর্য্য-কাদম্বিনী–গ্রন্থে **'নিষ্যন্দ বন্ধুরা'** নামক চতুর্থ-অমৃত-বৃষ্টি।

## পঞ্চম্যমৃত বৃষ্টি ঃ

# উপলব্ধাস্বাদ (রুচি)

যখন ভক্ত অভ্যসরূপ অগ্নির দ্বারা দীপ্ত এবং স্বশক্তি চালিত ভক্তিকাঞ্চনমুদ্রা হৃদয়ে ধারণ করেন, তখন রুচি উৎপন্ন হয়। যখন কোন ব্যক্তি শ্রবণ, কীর্তনাদি ভক্তি অনুশীলনে অধিক স্বাদ অনুভব করে এবং অন্য কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয় না, তাকে বলা হয় রুচি। 'রুচি' স্তরে নিরন্তর শ্রবণ, কীর্তনাদি অনুশীলন করলেও অন্য স্তরের ন্যায় কোন প্রকার শ্রম বা ক্লান্তি অনুভব হয় না। এই রুচি শ্রবণ, কীর্তনাদি ভক্তি মূলক সেবার প্রতি তীব্র আসক্তি উৎপাদন করে থাকে। ঠিক যেমন যখন কোন ব্রাহ্মণ বালক নিত্য শাস্ত্র-অধ্যয়ন করতে করতে শাস্ত্রার্থ উপলব্ধি করতে পারে, তখন শাস্ত্রে রুচি জন্মে; তার ফলে শাস্ত্র অনুশীলণে তার কোন শ্রম বোধ হয় না। বরঞ্চ তার কর্তব্য সম্পাদনে সে আনন্দ লাভ করে।

এ সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্ত একটি উদাহরণের দ্বারা ভাল ভাবে বোঝা যেতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তি পাণ্ডুরোগের (যকৃতের রোগ) দ্বারা আক্রান্ত থাকার ফলে মিষ্টি দ্রব্য তার কাছে তিক্ত অনুভূত হয়। পাণ্ডুরোগী মিছরির মিষ্টতা জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করতে পারে না। কিন্তু মিছরির নিয়মিত সেবনই ঐ রোগীর রোগ নিরাময়ের মহৌষধ। এই বিষয় জেনে প্রত্যহ যদি সে মিছরি সেবন করে, তবে ক্রমে ক্রমে মিষ্টতার অনুভব হয় এবং তাতে রুচি জন্মে। ঠিক সেইভাবে, অবিদ্যাদি বিভিন্ন ক্লেশের দ্বারা আক্রান্ত মানুষ যদি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্তনাদি ভক্তিযোগ অনুশীলন করে তাহলে তার অবিদ্যাদি রোগ দূর হয়। তারপর ক্রমশঃ এই সমস্ত ভক্তি মূলক কার্যকলাপের প্রতি রুচি জন্মে।

রুচি দুই প্রকার ঃ- (১) বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী এবং (২) বস্তুবৈশিষ্ট্যানপেক্ষিণী।





বস্তুবৈশিষ্ট্য বলতে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির বৈশিষ্ট্য কে বোঝায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ–কেউ কীর্তন শ্রবণ করতে ভালবাসে, যদি তা শ্রুতিমধুর হয়, এবং ঠিকমতো সুর তালসহ গাওয়া হয়ে থাকে। ভগবানের চরিত্র বর্ণন ভালবাসে, যদি তা দক্ষতাপূর্ণভাবে কাব্য অলঙ্কার, গুণ সমন্বিত ভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিগ্রহ পূজা ভাল লাগে, যদি তা নিজ অভিরুচি অনুসারে দেশ, কাল উপযুক্ত দ্রব্যাদি সহ হয়ে থাকে। এই প্রকার রুচিকে বস্তু বৈশিষ্ট্যাপেক্ষণী রুচি বলা হয়। এটি ঠিক যেমন মন্দ-ক্ষুদা-সম্পন্ন ব্যক্তি ভোজনে বসে কি কি এবং কি প্রকার ব্যঞ্জন আছে, এইরূপ প্রশ্ন করে। এর কারণ হচ্ছে অন্তঃকরনে স্বল্প পরিমানে দোষ বা অশুদ্ধতার উপস্থিতি। সুতরাং বুঝতে হবে যে এইরূপ কীর্তনাদি ভক্তিমূলক রুচিও অন্তঃকরণে দোষে আভাসরূপা বলে জানতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের রুচি সম্পন্ন (বস্তু বৈশিষ্ট্যানপেক্ষিণী) ব্যক্তি শ্রবণ, কীর্তনাদি অনুশীলনের প্রারম্ভ থেকেই আনন্দ লাভ করে। তবে যদি বস্তু বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে তার হৃদয় আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। এর অর্থ হচ্ছে তার হৃদয়ে বিন্দু মাত্র দোষ নাই।

"হে বন্ধু, তুমি কেন বৃথা পারিবারিক জীবন, ধন, সম্পদ, তাদের সুরক্ষা ইত্যাদি কথায় মগ্ন হয়ে অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণের নামকে উপেক্ষা করছ? তোমাকে আর কি বলব? আমি নিজেই এত পাপাচারী যে, যদিও আমি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অমূল্য ভক্তি রত্ন প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তবুও আমি এত মন্দ ভাগ্য যে তাকে আমার কাপড়ের আঁচলে বেঁধে রাখলাম, কিন্তু এর যথার্থ মূল্য না বুঝেই মিথ্যা ভৌতিক সুখের আশায় কানাকড়ির অন্বেষণে কর্মসমুদ্রের তীরে ভ্রমন করে বেড়ালাম। এভাবে আমার জীবনের বহু বছর বৃথা অতিবাহিত হয়ে গেল। ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদন না করে আমি কেবল অলসভাবে জীবন কাটিয়েছি।

হায়! হায়! আমি এমনি দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন যে, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা, কটু, গ্রাম্যবার্তালাপে মগ্ন করে এ পর্যন্ত শ্রীভগবানের অমৃতময় নাম, গুণ, লীলাদি

শ্রবণে উদাসীন থাকলাম। যখন আমি ভগবানের কথা শ্রবণ করতে আরম্ভ করি, সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রায় ঢলে পড়ি, কিন্তু গ্রাম্য বার্তা আরম্ভ হলেই তৎক্ষনাৎ জাগ্রৎ হয়ে তা শ্রবণে (উৎসুক) উৎকর্ণ হয়ে উঠি। এভাবে বহুবার আমি সাধু সমাজকে কলঙ্কিত করেছি। এমন কি এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ অবস্থাতেও কেবল উদর পূর্তির জন্য আমি কত পাপ কর্ম না করেছি? এই সমস্ত পাপের জন্য না আমাকে কোন নরকে কত কাল দুঃখ ভোগ করতে হবে?" এই ভাবে ভক্ত তার পূর্বাবস্থা সম্পর্কে অনুতাপ করে।

তারপর কোন দিন কোনস্থানে ঐ ভক্ত ভ্রমরের ন্যায় মহোপনিষদ কল্প বৃক্ষের ফলের সারস্বরূপ অমৃতের (শ্রীমদ্ভাগবত) আস্বাদ লাভ করে। সেদিন থেকে সে নিরন্তর ভক্তদের সঙ্গে অবস্থান করে, তাদের সঙ্গে বসে ভগবানের অমৃত রসময় লীলা আলোচনা পূর্বক আস্বাদন করে এবং অন্য সমস্ত কথা পরিত্যাগ করে। বারংবার তাদের মহিমা গান করে, সে পবিত্র ধামে বা ভগবদ্‌গৃহে প্রবেশ করে এবং ভগবানের প্রতি শুদ্ধ সেবায় নিষ্ঠা যুক্ত হয়, অর্থাৎ সেবানিষ্ঠা লাভ করে। তখন মূর্খ লোকেরা তাকে পাগল বলে মনে করে।

ভক্তের আনন্দময় ভগবদ্ চিন্তা এবং সেবারূপ নৃত্যের অনুশীলন করতে রুচি রূপা নর্তকী, তাকে স্বয়ং শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার দুবাহু ধরে টেনে নিয়ে যায়। তখন সে অভূতপূর্ব অকল্পনীয় পরমানন্দ লাভ করে। যথাসময়ে যখন ভাব ও প্রেমরূপ নটগুরু দ্বয় এই ভক্তকে নাচাতে আরম্ভ করবে, তখন তিনি কি অবস্থায় উপনীত হয়ে কি যে আনন্দ লাভ করবেন, তার সীমা কে বর্ণনা করতে পারে?

–ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত মাধুর্য্য-কাদম্বিনী–গ্রন্থে 'উপলব্ধাস্বাদ' নামক পঞ্চম-অমৃত-বৃষ্টি।

## ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টি ঃ

# মনোহারিনী (আসক্তি)

এর পর যখন ভজনের প্রতি রুচি চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র তার ভজনের বিষয় হয়ে থাকেন, তখন সে আসক্তি লাভ করে। আসক্তি স্তরে ভক্তি কল্পলতা মুকুল ধারণ করে অবিলম্বে ভাবরূপ পুষ্প ও প্রেম ফল ধারনের সূচনা প্রদান করে। রুচি এবং ভাবের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, রুচির স্তরে ভজনই তার বিষয় (এখানে ভজনের প্রাধান্য)। আসক্তি স্তরে ভজনের বিষয় অর্থাৎ ভজনীয় বস্তু ভগবানই মুখ্য বিষয় (এখানে ভজনীয় বস্তু ভগবানের প্রাধান্য)। বস্তুতঃ রুচি আসক্তি উভয় উভয়েরই বিষয়। কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে–রুচি আসক্তির অপরিপক্ক অবস্থা। আসক্তি রুচির পরিপক্ক অবস্থা। আসক্তি চিত্ত দর্পনকে এরূপভাবে মার্জিত করে যে, ভগবান উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়ে যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হন।

"হায়! আমার মন জড় বিষয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চালিত হচ্ছে, আমি একে শ্রীভগবানে নিযুক্ত করি।" আসক্তির পূর্বে ভক্ত বুঝতে পারে যে তার চিত্ত বা মন জড় বিষয় বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাই সে তার নিজের সমস্ত প্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা সেই বিষয় থেকে মনকে নিবৃত্ত করে এবং ভগবানের রূপ গুণাদিতে নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করে। আসক্তির উদয় হলে মন স্বাভাবিক ভাবেই কোন বিশেষ চেষ্টা ব্যতিরেকে ভগবদ্ চিন্তনে নিমগ্ন থাকতে পারে। এমনকি নিষ্ঠা স্তরেও ভক্ত বুঝতে পারে না, কিভাবে এবং কখন তার মন ভগবানের রূপ, গুণাদি বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে জড় বিষয়ে নিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অপরপক্ষে আসক্তি স্তরে ভক্ত বুঝতে পারে না, কিভাবে এবং কখন তার মন জড় বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে স্বতঃ স্বাভাবিক ভাবে ভগবানের কথায় নিমগ্ন হয়ে যায়। যারা আসক্তির নিম্নস্তরে আছে তারা এটি উপলব্ধি করতে পারে না। কেবলমাত্র আসক্তিশীল ভক্ত এই বিষয়টি অনুভব করতে পারবে।

আসক্তি সমন্বিত ভক্ত প্রাতঃ কালে কোন সাধুকে দর্শন করে তাকে বলতে শুরু করেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন? মনে হচ্ছে আপনার গলায় একটি সুন্দর পেটিকার মধ্যে শালগ্রাম শিলা ঝুলছে। ভগবানের নাম ধীরে ধীরে জপ করতে করতে আপনার জিহ্বা প্রতিমুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ নামামৃত আস্বাদনে আন্দোলিত হচ্ছে। আপনি আমার মত দুর্ভাগার দৃষ্টি পথে এসে কেন যে আমাকে আনন্দ প্রদান করছেন তা আমি জানি না। দয়া করে যে সমস্ত পবিত্র ধাম আপনি ভ্রমন করেছেন, তাদের সম্বন্ধে আমাকে বলুন। যে সমস্ত মহাত্মাদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং যে প্রকার ভগবৎ-অনুভূতি লাভ করে আপনি আত্মাকে ও অপরকে কৃতার্থ করছেন, সে সব বিষয় আমাকে বলুন।" এই ভাবে ঘনিষ্ঠ আলাপের মাধ্যমে কিছু সময় তিনি কথামৃত পানে অতিবাহিত করতে থাকেন।

তারপর অন্যত্র অন্যকোন ভক্তকে দেখে বলবেন, "আপনার বগলের মনোরম পুস্তকটি আপনাকে অত্যন্ত শ্রীমান করে তুলেছে। তাই আমার মনে হয় আপনি মহান বিদ্যান এবং আত্মসাক্ষাৎকারী। অতএব দয়া করে আপনি দশম স্কন্ধের একটি শ্লোক পাঠ করে তার অর্থ ব্যাখ্যা-রূপ অমৃত বৃষ্টির দ্বারা আমার কর্ণ-রূপ চাতক পক্ষীর জীবন দান করুন।"

এইভাবে শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে রোমাঞ্চিত শরীরে অন্যত্র গিয়ে সাধু সমাজে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন- "হায়! আজ সাধুসঙ্গে আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হবে এবং আমার জীবন ধন্য হবে।" এইরূপ চিন্তা করে তিনি তাদেরকে ভুমিতে দণ্ডবৎ প্রনাম করবেন। সভায় ভক্ত শিরোমণি একজন মহাভাগবত কর্তৃক স্নেহভরে অভিনন্দিত হয়ে তিনি তাদের সামনে সংকুচিত হয়ে অবস্থান করবেন। তিনি অত্যন্ত বিনয় সহকারে চক্ষু থেকে অশ্রু মোচন করে তাঁর নিকট কৃপা ভিক্ষা করে বলবেন, "হে প্রভু আপনি বৈদ্য শিরোমনি, ত্রিভুবনের সমস্ত যোগ্য বৈদ্য। আমি অত্যন্ত পতিত এবং দীন, কৃপাপূর্বক আমার নাড়ী পরীক্ষা করে দেখুন এবং আমার রোগ নিরূপন করে কি ঔষধ ও পথ্য আমার প্রয়োজন তা উপদেশ করুন, যাতে আমার অভীষ্টের পুষ্টি সাধন হয়।" সেই মহাভাগবতের কৃপা কটাক্ষে এবং তার উপদেশামৃত লাভে আনন্দিত হয়ে সেই ভক্তের পাদপদ্মে সেবার জন্য কিছুদিন সেখানে অবস্থান করবেন।



কোন কোন সময়ে প্রেমপূর্ণভাবে বনে পরিভ্রমন করতে করতে মৃগ, পশুপক্ষীগণের স্বাভাবিক চেষ্টাকেও তাঁর প্রতি ভগবদনুগ্রহ নিগ্রহের লক্ষণ বলে মনে করেন। তিনি বলেন, "যদি কৃষ্ণের আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি থাকে, তবে কৃষ্ণসার মৃগটি দূর থেকে আমার দিকে তিন চার পদ আগমন করুক। যদি তাঁর কৃপা না থাকে তাহলে সে ঘুরে আমাকে পিছনে রেখে চলে যাক।"

গ্রামের প্রান্তে ব্রাহ্মণ বালকগণকে খেলা করতে দেখে তাদেরকে সনকাদি ঋষি মনে করে "আমি কি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করতে পারব?" এরূপ প্রশ্ন করার পর তাদের অস্পষ্ট উত্তরকে কখনো দুর্ব্বোধ্য, কখনো বা সুখবোধ্য বলে মনে করেন। তিনি ভাবতে থাকেন সেই উত্তরের প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করবেন কিংবা তার আরও গভীর অর্থ জানবার প্রয়াস করবেন।"

"কোন কোন সময়ে তিনি তার গৃহে একজন ধনী কিন্তু সম্পদ লোভে কৃপন বনিকের মতো অবস্থান করে চিন্তা করেন "আমি কোথায় যাব, কি করব, কি উপায়ে আমার এই অভীষ্ট বস্তু হস্তগত হবে?" এইভাবে ব্যকুলিত হয়ে পরিম্লান বদনে সারা দিন তিনি চিন্তা করতে করতে, কখনো নিদ্রা যান, কখনো ওঠেন, কখনো বা বসেন। যখন তার পরিজনেরা তাকে কোনোকিছু জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি মুকের ন্যায় অবস্থান করেন এবং কখনো তিনি স্বাভাবিক ভাব দেখিয়ে তার অন্তরের ভাবকে গোপন করে রাখার চেষ্টা করেন। তার বন্ধুগণ বলেন, "অধুনা এর বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছে।" অজ্ঞ প্রতিবেশী গণ বলে থাকেন, "সে জন্ম থেকেই স্বাভাবিক ভাবে জড়।" মীমাংসকগণ তাকে মুর্খ বলে মনে করেন। বৈদান্তিকগণ তাকে ভ্রান্ত বলে মনে করেন, কর্মী অর্থাৎ শুভ কর্মানুষ্ঠানকারীগণ তাকে ভ্রষ্ট বা বিপথ চালিত বলে, বলে থাকেন। ভক্তগণ বলেন যে, সে জীবনের সারবস্তু প্রাপ্ত হয়েছেন। অপরাধীগণ তাকে দাম্ভিক প্রতারক বলে, বলে থাকেন। কিন্তু সেই ভক্তটি লৌকিক মানাপমান বিচারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ভগবানের প্রতি আসক্তি রূপ মহাস্বর্গীয় নদীর স্রোতে পতিত হয়ে পূর্ববৎ নানাদিপ্রকারে চেষ্টা করতে করতে প্রেমসিন্ধুর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

–ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত মাধুর্য্য-কাদম্বিনী–গ্রন্থে **'মনোহারিণী'** নামক ষষ্ঠ-অমৃত-বৃষ্টি।

## সপ্তম্যমৃত বৃষ্টি ঃ

# পরমানন্দ নিষ্যন্দি (ভাব)

যখন আসক্তি চরম পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়, তাকে বলা হয় রতি বা ভাব। এই ভাব হচ্ছে ভগবানের সৎ, চিৎ ও আনন্দ নামক স্বরূপ শক্তিত্রয়ের (সন্ধিনী, সম্বিত, হ্লাদিনী) মুকুলিত অবস্থা। এই ভাব অবস্থায় সাধক শুদ্ধসত্ত্ব স্তরে প্রবেশ করে এবং এই শক্তিগুলি উদিত সূর্য রশ্মির ন্যায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এটি ঠিক ভক্তি কল্পলতার প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায়। ইহার বহির্ভাগের কান্তি বা প্রভা হচ্ছে সুদুলর্ভা গুণসম্পন্ন অর্থাৎ সহজলভ্য নয় এবং অন্তর্ভাগটির প্রভা হচ্ছে মোক্ষলঘুতাকৃৎ অর্থাৎ আভ্যন্তরীন প্রভা মোক্ষকেও তুচ্ছ করে থাকে। এই ভাবের একটি পরমানুই সমস্ত তমোকে সমূলে উৎপাটন করে দেয়। ভাব-কুসুম থেকে প্রচুর সুগন্ধ নিঃসৃত হয়ে ভ্রমর রূপ মধুসূদনকে নিমন্ত্রণ পূর্বক সেখানে প্রকাশ করায়। আর অধিক কি বলব? ভাব দ্বারা সুবাসিত সমস্ত চিত্তবৃত্তির অনুরাগ দ্রবীভূত হয়ে শ্রীভগবানের সকল অঙ্গকে স্নেহসিক্ত (স্নেহের প্রলেপ) করতে সমর্থ হয়। এমনকি এই ভাব আবির্ভূত হলে এর প্রভাবে চণ্ডালও ব্রহ্মাদির নমস্য হয়ে ওঠেন। সেই সময় অর্থাৎ ভাবের উদয় হলে ভক্তের নয়ন যুগল ব্রজেন্দ্রনন্দনের অঙ্গ সমূহের শ্যামলিমা, তাঁর গোলাপী রং এর অধর ও নেত্র প্রান্তের অরুনিমা, তাঁর হাস্যজ্জ্বোল বদনে চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্র জোর্তিময় দন্ত পঙক্তির ধবলিমা এবং তাঁর পীতবসন ও অলংকারের প্রীতিমা দর্শন করতে পূর্ণমাত্রায় আকাঙ্খিত হয়। তখন তার কণ্ঠরুদ্ধ হয় এবং নয়ন যুগলের অজস্র অশ্রুধারা তাঁকে অর্থাৎ তার আত্মাকে অভিসিক্ত করে তোলে। তার ফলে সেই ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর মুরলীধ্বনি, নূপুরের রুনুঝুনু, মধুর কণ্ঠের সুস্বর এবং তাঁর চরণ কমল পরিচর্যার জন্য সাক্ষাৎ নির্দেশ শ্রবণ করে (নিজেকে) আত্মাকে চরিতার্থ করবার জন্যই এখানে সেখানে অন্বেষণ করতে থাকে এবং কখনও কর্ণদ্বয়কে উর্দ্ধে স্থাপন পূর্বক নিশ্চল ভাবে





অবস্থান করে। এভাবে কখনোও তার (ভগবানের) করকমলদ্বয়ের স্পর্শ যে কিরূপ তা চিন্তা করে, তার শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়। ভগবানের অঙ্গের সৌরভ ঘ্রানের আশায় বারংবার নাসিকাদ্বয় বিস্ফোরিত করে, ক্ষণে ক্ষনে শ্বাস গ্রহণ করে পরম পুলকিত হয়ে থাকে, "হায় তাঁর অধরসুধা আস্বাদন করার সৌভাগ্য কি আমার কখন হবে?"- সেই স্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে এরূপ মনে করে সে পরমানন্দ লাভ করে। তার ওষ্ঠাধর জিহবার দ্বারা লেহন করে। কখনো বা তার হৃদয়ে ভগবৎ স্ফূর্তি হওয়ায় তাঁকে যেন সাক্ষাৎ লাভ করছে এরূপ মনে করে তার চিত্তে আনন্দ উল্লাসের আবির্ভাব হয়। ফলস্বরূপ সেই সময়ে কখনো সে ভগবানের দূর্লভ মাধুর্য সম্পদ লাভ করে মত্ত হয়ে যায়, আবার কখনো সেই অনুভব অন্তর্হিত হলে বিষাদগ্রস্থ এবং গ্লানিযুক্ত হয়। এইরূপে ৩৩টি লক্ষণ যুক্ত সঞ্চারি ভাবের দ্বারা তার শরীর অলংকৃত হয়ে ওঠে।

এই রতিমান সাধকের এই বুদ্ধি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি পথের পথিক হয়ে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে। তার অহন্তা বা আমিত্ব ভগবানের সেবা করার উপযোগী সিদ্ধ দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। এবং তিনি তার ভৌতিক শরীরটি যেন প্রায় ত্যাগকরে অবস্থান করতে থাকেন। তার মমতা (আমার এইরূপ ভাব) মধুকরীর ন্যায় ভগবানের চরণারবিন্দের মকরন্দ আস্বাদনে বিভোর হয়ে যায়। মহা অমূল্য ভাবরত্ন প্রাপ্ত হয়ে ঐ ভক্ত কৃপণের ন্যায় জনসাধারণ থেকে সেই ভাবকে গোপনে রাখতে চেষ্টা করেন। তথাপি যেন 'ন্যায়' দর্শন অনুসারে উল্লসিত মুখমণ্ডল অন্তর্ধনের পরিচায়ক, তেমনি ভাব স্তরে উপনীত ভক্তের হৃদয়ে সহিষ্ণুতা ও বৈরাগ্য গুণের প্রকাশ হওয়ায় বাহ্যিক আচরণ দেখেই বিজ্ঞ সাধুগণ তার অন্তরের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই সমস্তকিছু বুঝতে না পেরে তাকে বিক্ষিপ্ত এবং পাগল বলে মনে করে। এই ভাব আবার দুই প্রকার–

১। রাগ ভক্ত্যুত্থ অর্থাৎ রাগ ভক্তি থেকে জাত ভাব।
২। বৈধ ভক্ত্যুত্থ অর্থাৎ বৈধী ভক্তি থেকে জাত ভাব।

প্রথমটি অর্থাৎ রাগানুগা ভক্তি থেকে উৎপন্ন ভাব জাতি (quality) এবং পরিমানের (quantity) আধিক্য হেতু অতিশয় গাঢ়। এইক্ষেত্রে ভগবানের মহিমাজ্ঞানে অনাদর বশতঃ ভক্ত নিজেকে ভগবানের সমান বা

তার অপেক্ষা অধিক এরূপ মনে করে। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বৈধী ভক্তি থেকে উৎপন্ন ভাব, জাতি ও পরিমানে প্রথমটির (ভক্ত্যুত্থ ভাব) থেকে ন্যূনতা বশতঃ তার মত গাঢ় নয়। এই ক্ষেত্রে ভগবানের প্রতি তার ঐশ্বর্যজ্ঞানযুক্ত মমতা পরিলক্ষিত হয়। (যার জন্য এখানে ভাব ততটা গাঢ় নয়)। এই দুইরকমের ভাব দুই শ্রেণীর ভক্তদের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ বাসনা যুক্ত হৃদয়ে স্ফুরিত হয়ে দুইভাবে আস্বাদিত হয়ে থাকে।

যেভাবে আম, কাঁঠাল, ইক্ষু বা দ্রাক্ষাদির রসের ঘনতা বা গাঢ়তা বিভিন্ন প্রকারের। তদ্রুপ ভাবেরও মাত্রানুসারে পৃথক পৃথক স্তর আছে। পৃথক পৃথক ভাব আস্বাদনকারী ভক্তগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচ প্রকার। শান্ত ভক্তে শান্তি, দাস্য ভক্তে প্রীতি, সখায় সখ্য, পিতৃ মাতৃ ভাব যুক্ত ভক্তে বাৎসল্য, এবং প্রেয়সী-ভাব যুক্ত ভক্তে প্রিয়তা অর্থাৎ শান্ত ভক্ত শান্তিতে, দাস্য ভক্ত প্রীতিতে, সখা ভক্ত সখ্য ভাবে পিতৃ-মাতৃ ভাব যুক্ত ভক্ত বাৎসল্য ভাবে এবং প্রেয়সী ভাবযুক্ত ভক্ত প্রিয়তা ভাবে কার্য করে থাকেন।

পুনরায় এই পাঁচ প্রকারের ভাব নিজ নিজ শক্তির দ্বারা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকী ও ব্যভিচারী ভাব রূপ প্রজা সকলকে প্রাপ্ত হয়ে নিজেরা ঐশ্বর্য সমন্বিত স্থায়ীভাবরূপ রাজার ন্যায় এই সমস্ত প্রজাগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও উজ্জ্বল নামে পরিপক্ক অবস্থায় রস রূপে পরিণত হন।

শ্রুতিতে আছে স্বয়ং ভগবানই রস স্বরূপঃ "রসো বৈ সঃ রসং হি এবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"–

ভগবান স্বয়ং রস স্বরূপ, সেই রস লাভ করে অর্থাৎ সেই রসস্বরূপ ভগবানকে লাভ করে জীব আনন্দময় হয়ে ওঠে। যদিও সমস্ত ধারা, নদী এবং পুষ্করিনীতে জল আছে তথাপি সাগর সমস্ত জলের মহান আধার বা আশ্রয়, সেইরূপ ভগবানের সকল অবতার এবং অবতারীর মধ্যে ঐ রস আবির্ভূত হলেও তাদের মধ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে রস পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। যখন ভাব পরিপক্কতা লাভ করে প্রেমে উপনীত হয় তখন সেই রস-স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রসিক ভক্তদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত হন।

–ইতি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত মাধুর্য্য-কাদম্বিনী–গ্রন্থে 'পরমানন্দ নিষ্যন্দি' নামক সপ্তম-অমৃত-বৃষ্টি।

### অষ্টম্যমৃত বৃষ্টি ঃ

# পূর্ণমনোরথ (প্রেম)

ভক্তি কল্পলতার সাধনাখ্যা পত্র দুটির আবির্ভাব বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখন ভাবকুসুমের চারপাশে শ্রবণ, কীর্তনাদি ভজন অতিশয় মসৃনতা প্রাপ্ত হওয়ায় সহসা অনুভাব রূপ (পরমানন্দ এর লক্ষণ) বহু পাপড়ি উদ্ভূত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে শোভা বর্ধিত করে। সেই অতিশয় উজ্জ্বল, পূর্ণবিকশিত ভাব কুসুম পরিণাম প্রাপ্ত হয়ে প্রেম ফল উৎপন্ন করে। এই ভক্তি কল্পলতার অতি আশ্চর্য স্বভাব হল যদিও তার পত্র, স্তবক, পুষ্প ও ফল পরবর্তী অবস্থায় পরিনত হয়, তবুও তাদের পূর্বের মূল-রূপটি থেকেই যায়। তারা সকলেই নিত্য নবনবায়মান রূপে শোভা পেতে থাকে।

যদিও পূর্বে ভক্তের চিত্তবৃত্তি অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে শরীর, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন-গৃহ এবং ধনাদির প্রতি মমতারূপ রজ্জুর দ্বারা দৃঢ় ভাবে নিবদ্ধ ছিল। তবুও এখন প্রেম সেই সকল চিত্তবৃত্তিকে অবহেলা ক্রমে অর্থাৎ অনায়াসে মুক্ত করে। তারপর মায়িক হলেও প্রেম তার নিজস্ব শক্তি দ্বারা সেই চিত্তবৃত্তিকে অধিকার করে এবং তাদেরকে মহারস কূপে নিমজ্জিত করায়। সেই মহারসের স্পর্শ মাত্রই তারা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে সচ্চিদানন্দ জ্যোতির্ময়ী চিত্তবৃত্তিতে পরিণত হয়। তারপর প্রেম এই চিন্ময় চিত্তবৃত্তিকে ভগবানের নাম, রূপ এবং গুণের মাধুর্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে। অতি উজ্জ্বল উদিত সূর্যের ন্যায় এই প্রেম হৃদয়াকাশের নানা পুরুষার্থ-রূপ নক্ষত্র সমূহকে তৎক্ষণাৎ দূরীভূত করে থাকে।

ভক্ত প্রেমফল থেকে নির্গত অমৃত সান্দ্রানন্দ রূপে আস্বাদন করে থাকেন, অর্থাৎ প্রেম ফলের যে আস্বাদনীয় রস, তা সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা। এই রসের পরম পুষ্টিকারীনি শক্তি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণী অর্থাৎ যে শক্তি শ্রীকৃষ্ণকেও

আকর্ষণ করতে পারে। বলা বাহুল্য যখন ভক্তি এই অমৃতময় রস আস্বাদন করেন তখন তিনি আর কোন প্রকার বিঘ্নকে গ্রাহ্য করেন না। যেমন বলশালী যোদ্ধা নিজেকে ভুলে যুদ্ধে মত্ত হয়ে ওঠে বা চোর ধনলোভে উন্মত্ত হয়ে বিচার শূন্য হয়ে যায়, ঠিক তেমন ভাবেই ভক্ত প্রেম আস্বাদনে রত হয়ে নিজেকেও বিস্মৃত হয়ে যান। অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যবস্তু ও অপরিমিত পরিমানে দিবারাত্র পুনঃ পুনঃ ভোজনে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। এই প্রকার দুর্দমনীয় কোন ক্ষুধার অস্তিত্ব যদি সম্ভব হয়, তবে ভক্ত সেই ক্ষুধার ন্যায় (ভগবানের প্রতি) উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। এই উৎকণ্ঠা ভক্তকে তেজোময় সূর্যের ন্যায় দগ্ধ করতে থাকে এবং একই সঙ্গে আবার ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের অপরিমিত রূপ, গুণ, ও মাধুর্যের স্ফূর্তি জন্মায়। সেই সকল আস্বাদন করে ভক্ত কোটি চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ শীতলতা অনুভব করেন।

এই অদ্ভুত প্রেম যুগপৎ উৎকণ্ঠার প্রাবল্য এবং শান্তির মাধুর্য উভয় বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন অনুভূতি প্রদান করে থাকে। এই প্রেম স্বীয় আধার স্বরূপ ভক্তের হৃদয়ে উদিত হয়। সেই প্রেম ঈষৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে প্রতি মুহূর্তে শ্রীভগবদ্ সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক ভক্তের উৎকণ্ঠারূপ শল্যকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করে। এর ফলে উৎকণ্ঠা আরও প্রবল হয়। এবং ভক্ত নিজ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত শ্রীভগবানের রূপ ও লীলার মাধুর্য আস্বাদন করেও অতৃপ্ত থাকেন অর্থাৎ পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারেন না।

এই অবস্থায় তার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে জলহীন শুষ্ক অন্ধকূপের ন্যায় অব্যবহার্য অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। তিনি গৃহকে কন্টকাকীর্ণ মনে করেন। সমস্ত আহার্য খাদ্যদ্রব্যের প্রতি তার অরুচি জন্মে, আহার প্রহারের ন্যায় মনে হয়, অন্য ভক্তবৃন্দ কর্তৃক প্রশংসা তাকে সর্পে দংশনের জ্বালা প্রদান করে। নিত্য কর্তব্যকর্ম তার নিকট মৃত্যুর মত যন্ত্রনাদায়ক বলে মনে হয়, শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি মহাভার মনে করেন, বন্ধুদের সান্ত্বনা বিষের মতো লাগে। যদিও সর্বদা জাগ্রত থাকেন, সেই জাগ্রত অবস্থা অনুতাপের সাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যদি কখনো বা নিদ্রা যান, তবে তা মৃত্যু যন্ত্রনার ন্যায় অনুভব হয়। নিজের শরীর ধারনকেও মূর্তিমান ভগবদ নিগ্রহের ন্যায় ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস (প্রাণ বায়ু) বার বার আগুনে ভাজতে থাকা ধান্যের ন্যায় মনে হয়। অধিক আর কি বলা যায়? পূর্বে যে সমস্ত বস্তু একান্ত প্রিয় বলে মনে



হত সেগুলিই এখন ঘোর বিপদ বা উপদ্রবের ন্যায় বোধ হয়ে থাকে। এমনকি ভগবদ্ চিন্তনও তার পক্ষে আত্মনিকৃন্তনের ন্যায় (অর্থাৎ শরীর যেন চূর্ন বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে) মনে হয়। তারপর একদিন এই অবস্থায় প্রেম চুম্বক কৃষ্ণবর্ণ লৌহ সদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে ভক্তের নয়ন গোচর করায়।

ভগবান তখন ভক্তের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সৌন্দর্যতা, সৌরভ, সুস্বরতা, সুকুমারতা, সুরসতা, উদারতা এবং কারুণ্য প্রভৃতি স্বীয় পরম মঙ্গলময় গুণের দ্বারা প্লাবিত করে থাকেন, অর্থাৎ ভগবান তাঁর এই সমস্ত পরম মঙ্গলময় গুণসমূহ ভক্তের নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের গোচরিভূত করে থাকেন। ভক্ত যখন প্রেম সহকারে এই সমস্তগুণের আস্বাদন করতে থাকে তখন সেগুলির অসাধারণ মধুরতা ও নিত্য নতুনতা ভক্তের হৃদয়ে প্রতিক্ষণ প্রবল উৎকণ্ঠা বর্ধিত করতে থাকে। এই সময়ে যে দিব্য পরমানন্দের সাগর আবির্ভূত হয় তা বর্ণনা করতে কোন কবি বা সাহিত্যিক সমর্থ নন।

ঐ পরমানন্দ সাগরের একবিন্দুর ধারনা লাভে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। একজন পথিক গ্রীষ্মকালীন সূর্যের প্রচন্ড উত্তাপে আক্রান্ত হয়ে একটি ঘন শাখা প্রশাখা যুক্ত বিশাল বট বৃক্ষের (যার চারপাশে শত শত হিমশীতল গঙ্গা জল পূর্ণ ঘট সঞ্চিত রয়েছে) শীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করলে যে আনন্দ লাভ করে, বহু সময় যাবৎ দাবাগ্নির দ্বারা পীড়িত বণ্য হস্তি পরিশেষে (মেঘের) অপরিমিত বৃষ্টি ধারায় অবগাহন করলে যে আনন্দ লাভ করে, কঠিন রোগে পীড়িত এবং তৃষ্ণা-কাতর ব্যক্তি অকস্মাৎ অতি মধুর অমৃত পান করে যেরূপ মহা আনন্দ অনুভব করে; সেই সমস্ত আনন্দ প্রেমী ভক্তের দিব্য আনন্দের তুলনায় কিছুই নয়।

প্রথমে অতিশয় চমৎকৃত ভক্তের নয়ন যুগলে ভগবান নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ করে থাকেন। তারপর তাঁর সৌন্দর্যের মধুরিমা ভক্তের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনকে এরূপ চক্ষু প্রাপ্ত করায় যাতে তিনি ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। ভক্তের মধ্যে অশ্রু কম্প, স্তম্ভাদি প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ লাভ করায় তিনি আনন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তখন ভগবান ভক্তকে সান্ত্বনা প্রদান করবার জন্য ভক্তের ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ে স্বীয় সৌরভ প্রকাশ করেন এবং সেই অপার মাধুর্যময় গন্ধের আশায় ভক্তের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন ঘ্রানেন্দ্রিয় ভাব প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় ভক্ত

যখন দ্বিতীয় বারের জন্য আনন্দ-মূর্ছা প্রাপ্ত হন তখন ভগবান তাকে বলেন, "হে আমার ভক্ত, আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার নিয়ন্ত্রনাধীন হয়েছি। দয়া করে বিহ্বল না হয়ে তোমার পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আমার মাধুর্য আস্বাদন কর।" এই ভাবে ভগবান ভক্তের শ্রবন ইন্দ্রিয়ে তাঁর পরমানন্দদায়ক সৌশ্বর্য্য আবির্ভূত করান এবং পূর্ববৎ (সেই মাধুর্য আস্বাদনের উৎকণ্ঠায়) ভক্তের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন শ্রবন ইন্দ্রিয়ের ভাব প্রাপ্ত হয়।

যখন ভক্ত তৃতীয় বারের জন্য আনন্দ মূর্ছা প্রাপ্ত হন তখন ভগবান কৃপা পূর্বক ভক্তের রসের তারতম্য অনুসারে তাঁর চরণ কমল, হস্ত বা বক্ষস্থলের স্পর্শ দান করে তাঁর সৌকৌমার্য বা সুকোমলতা প্রকাশ করেন। দাস্য রসের ভক্তকে তার মস্তকে চরণ কমলের স্পর্শ দান করেন। সখ্য ভাবের ভক্তের হস্ত স্বহস্তে ধারণ করেন। বাৎসল্য স্নেহ ভাবের ভক্তের নয়ন যুগল থেকে অশ্রু মোচন করে তাঁর করকমলের স্পর্শ দান করেন। মধুর রসের প্রেয়সীকে তাঁর বক্ষস্থলে স্থাপন করে আলিঙ্গনের মাধ্যমে সুকোমলতা অনুভব করিয়ে থাকেন। আবার যখন ভক্তের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন ভগবানের কোমলতাকে অনুভব করার জন্য স্পর্শ ইন্দ্রিয় ভাব প্রাপ্ত হয়। তখন ভক্ত চতুর্থ-বারের জন্য আনন্দ মূর্ছা প্রাপ্ত হতে উপক্রম করলে ভগবান তার পঞ্চম মাধুর্য , সৌরস্য অর্থ্যাৎ তার অধরের অমৃতময় স্বাদ ভক্তের রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করে ভক্তকে সান্তনা প্রদান করেন। কিন্তু এই সৌরস্য একমাত্র যারা মধুর রসের ভাব প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এই সৌরস্য লাভের ইচ্ছা করেন, তিনি তাদেরকেই প্রদান করে থাকেন, অন্যদেরকে নয়। ভক্তের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন পূর্বের ন্যায় ভগবানের সৌরস্য আস্বাদনের অভিলাষে রসনেন্দ্রিয় ভাব প্রাপ্ত হলে ভক্ত পঞ্চম বারের জন্য আনন্দ মূর্ছা প্রাপ্ত হন। এই আনন্দ মূর্ছা অতিশয় গাঢ় হওয়ার দরুন ভগবান অন্য কোন প্রকারের প্রবোধ দান করতে সমর্থ না হয়ে তাঁর ষষ্ঠ মাধুর্য ঔদার্য, ভক্তের উপর বিস্তার করেন। সৌন্দর্য্যাদি সকল গুণকে ভক্তের সর্বেন্দ্রিয়ে বল পূর্বক যুগপৎ বিতরণ করার নামই ঔদার্য।

তারপর প্রেম ভগবানের মন বুঝতে পেরে তাঁর ইঙ্গিতক্রমে বর্ধিত হয়ে চরম স্তর লাভ করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের তৃষ্ণাদিকেও বর্ধিত করে তোলে। ঐ প্রেম ভক্তের হৃদয়ে এক শক্তিশালী চন্দ্রের রূপ ধারণ করে আনন্দ সিন্ধুর উপর



শত শত তরঙ্গের সৃষ্টি করে। ভক্তের হৃদয়ে বা অন্তকরণে প্রতিদ্বন্দী ..প (আস্বাদন) সমূহের মধ্যে প্রায় ধ্বংসাত্মক আলোড়ন সৃষ্টি করে। অর্থাৎ প্রেম চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে সেই ভক্তের মধ্যে শত শত আনন্দ সিন্ধু তরঙ্গের লীলার দ্বারা আলোড়িত ও জর্জরিত করে থাকে। একই সময়ে মনের অধিদেবতা রূপে প্রেমরূপ চন্দ্র তার স্বীয় শক্তিকে বিস্তার করে ভক্তকে নির্বিবাদে যুগপৎ সমস্ত প্রকার রস আস্বাদন করিয়ে থাকে। এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, ভক্তের মধ্যে একাগ্রতার অভাবের দরুন তিনি সমস্ত প্রকারের রসগুলিকে পূর্ণমাত্রায় আস্বাদনে সক্ষম হবেন না। বরং ইন্দ্রিয়গুলি ভগবদ্ কৃপায় অচিন্ত্য, অত্যাশ্চর্য, অদ্ভূত শক্তি প্রাপ্ত হয়ে একই সময়ে পরস্পরের কার্য সাধন করার ক্ষমতা অর্জন করে। সকল ইন্দ্রিয় এক কালেই নয়নী ভাব, শ্রবণী ভাবাদি প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সৌন্দর্য এবং অন্য সমস্ত গুণের সান্দ্রতা বা পূর্ণানন্দময়ত্ব লাভ করে থাকে। অর্থাৎ শ্রীভগবানের অলৌকিক অচিন্ত্য শক্তি বলে তিনি অভূতপূর্ব চমৎকারীত্ব বিস্তার করে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একই সময়ে নয়ণী ভাব, শ্রবণী ভাবাদী প্রদান করে ঐ প্রকার আস্বাদনের অতি সান্দ্রত্ব বা পূর্ণনান্দময়ত্ব ঘটান। এই অলৌকিক বিষয়ে লৌকিক যুক্তি তর্কের কোন অবকাশ নাই অর্থাৎ এই অচিন্ত্য বিষয়বস্তু জড় জাগতিক তর্কের দ্বারা বোঝা যাবে না। শাস্ত্র নির্দেশ দিচ্ছেন–

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যৎ চ তদ্ অচিন্ত্যস্য লক্ষনম।।"

অচিন্ত্যের অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উর্দ্ধে। তাই লৌকিক যুক্তি তর্কের দ্বারা অচিন্ত্য বিষয় সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করো না।" (মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৫/২২)

পিপাসার্ত চাতক যদিও বর্ষার আগমনে বর্ষিত সমস্ত জলধারা পান করবার ইচ্ছা করে, তবু তার ক্ষুদ্র চঞ্চুপুটে কি করে তা সম্ভব? তদ্রুপ ভগবান যখন দেখেন-সেই অসহায় চাতক পাখীর ন্যায় ভক্ত তাঁর সৌন্দর্যাদি সমস্ত গুণ এককালে আস্বাদন করতে আশা পোষন করছে তখন তিনি মনে করেন, "আহা! আমি কেন এত সৌন্দর্য ধারণ করেছি?" তার ফলে ভগবান সে সমস্ত সৌন্দর্য সম্যক্ ভোগ করাবার জন্য তাঁর সপ্তম মাধুর্য কারুন্য বিস্তার করেন। এই কারুণ্য ভগবানের সমস্ত শক্তি সমূহের অধ্যক্ষা স্বরূপা। আগম-শাস্ত্রে ভগবৎ-শক্তির

ধ্যান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় অষ্টশক্তি (যারা আটটি পাপড়িতে অবস্থান করে) পরিবেষ্টিত এই কারুণ্য মহারাজ চক্রবর্ত্তিনীর ন্যায় বিরাজ করেন। (এই অষ্টশক্তি হচ্ছে–বিমলা, উৎকর্ষিনী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা এবং ঈশানী)। অনুগ্রহরূপে খ্যাত এই কারুণ্য শ্রীভগবানের নয়নারবিন্দ থেকে নিজেকে প্রকাশ করেন। এই শক্তির বিলাস দাস্যরসের ভক্তের নিকট কৃপাশক্তি রূপে, অন্যভক্তদের নিকট বাৎসল্য কখনও বা কারুণ্য রূপে এবং মধুররসের ভক্তে চিত্ত-বিদ্রাবিনী আকর্ষণী শক্তি (যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করে) রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের ভাব অনুসারে ঐ শক্তি স্নেহ, প্রীতি, মাধুর্য ইত্যাদি নামে প্রকাশিত হয়। ঐ কৃপা শক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানের ইচ্ছা শক্তি আত্মারাম মুণিগণেরও হৃদয়কে দ্রবীভূত করে আশ্চর্যজনক ভাবে ভক্তিতে আকৃষ্ট করে থাকে। এই কৃপাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভগবানের ভক্তবাৎসল্য নামক একটি গুণ শ্রীমদ্ভাগবতে পৃথিবী দেবী কর্তৃক বর্ণিত ভগবানের মঙ্গলময় গুণসমূহকে সম্রাটের ন্যায় শাসন করে থাকেন।

**সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্।**
**শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্।।**
**জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্যং শৌর্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।**
**স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্যং মার্দবমেব চ।।**
**প্রাগলভ্যং প্রশ্রয়ং শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।**
**গাম্ভীর্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্তিমানোহনহঙ্কৃতিঃ।।**
**এতে চান্যে চ ভগবান্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।**
**প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ।।**

শ্রীভগবানের মধ্যে অধিষ্ঠিত রয়েছে। (১) সত্যবাদিতা, (২) শুচিতা, (৩) অন্যের দুঃখে অসহনীয়তা, (৪) ক্রোধসংযমের ক্ষমতা, (৫) অল্পে তুষ্টি, (৬) ঋজুতা, (৭) মনের অচঞ্চলতা, (৮) বাহ্যেন্দ্রিয়াদির সংযম, (৯) কর্তব্য-অকর্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান, (১০) সাম্যভাব, (১১) সহণশীলতা, (১২) শত্রুমিত্র ভেদাভেদ-শূন্যতা, (১৩) বিশ্বস্ততা, (১৪) জ্ঞান, (১৫) ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে বিতৃষ্ণা, (১৬) নেতৃত্ব,



(১৭) শৌর্য, (১৮) প্রভাব, (১৯) সব কিছু সম্ভব করার ক্ষমতা, (২০) যথাযথভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের দক্ষতা, (২১) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা (পরাধীনশূন্য), (২২) কর্মকুশলতা, (২৩) সম্যক্ সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা, (২৪) উদ্বেগহীন ধৈর্য, (২৫) মৃদুতা, (২৬) অভিনবত্ব, (২৭) ভদ্রস্বভাব, (২৮) মুক্তহস্তে দান-দাক্ষিণ্য, (২৯) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, (৩) সকল জ্ঞানের পরিশুদ্ধি, (৩১) যথার্থ কর্মপ্রয়াস, (৩২) সকল ভোগ্য বস্তুতে অধিকার, (৩৩) উৎফুল্লতা, (৩৪) স্থৈর্য, (৩৫) নির্ভরযোগ্যতা, (৩৬) যশ, (৩৭) মাননীয়তা, (৩৮) গর্বশূন্যতা, (৩৯) ভগবত্তা, (৪০) নিত্যতা, এবং অন্যান্য আরো অনেক অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্যাদি যা নিত্য বিরাজমান ও যেগুলি কখনোই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। (ভাঃ ১/১৬/২৬-২৯)

শাস্ত্রে বর্ণিত ১৮ প্রকার মহাদোষ (মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, তীব্র-কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্খা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব, পরাপেক্ষা) ভগবানের মধ্যে কখনোই থাকে না।

ভগবানে এই সকল দোষ উপস্থিত না থাকলেও 'ভক্ত-বাৎসল্য' গুণের অনুরোধে রাম, কৃষ্ণ আদি অবতারে কখনো কখনো ভক্তগণ তা অনুভব করেন, এবং তখন ঐ দোষগুলি 'ভক্তবাৎসল্য' গুণের প্রভাবে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে মহাগুণত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

ভগবান কর্তৃক বিস্তারিত ঐ সকল সৌন্দর্যাদিগুণ ওজস্বী ভক্ত পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করতে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় সেই গুণের চমৎকারিত্ব এরূপ বর্ধিত হতে থাকে যে উপলব্ধি উত্তরোত্তর গাঢ় হয়। তারপর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উপলব্ধ ভগবানের অশ্রুতপূর্ব ভক্তবাৎসল্য গুণ ভক্তের হৃদয়কে দ্রবীভূত করে তোলে। তখন ভগবান ভক্তকে বলে থাকেন, "হে ভক্তশ্রেষ্ঠ! তুমি বহু জন্ম আমার জন্য স্ত্রী-পরিজন, গৃহ, সম্পদ পরিত্যাগ করে আমাকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা করেছ। আমারই সেবা করার উদ্দেশ্যে শীত, বাত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা, রোগাদি বহু ক্লেশ সহ্য করেছ। বহুলোকেদের দ্বারা অপমানিত হওয়া সত্বেও ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন যাপন করেছ। তোমার এই সমস্ত সাধনের প্রতিদানে আমি কিছু দিতে না পেরে, কেবল ঋণী হয়ে আছি। সার্বভৌমত্ব, যোগসিদ্ধি প্রভৃতি কিছুই তোমার পক্ষে উপযুক্ত নয়। সুতরাং আমি কি করে

তোমাকে তা দিতে পারি? তাই আমি অজিত হয়েও আজ তোমা কর্তৃক জিত হলাম। এখন তোমার সৌশীল্য লতাকুঞ্জই আমার আশ্রয়।"

এই সকল মধুময় কথা কর্ণকুণ্ডলের ন্যায় ধারণ করে ভক্ত বলতে থাকেন," হে প্রভু! হে ভগবান, করুণার সাগর; আমি যখন ঘোর সংসার কুম্ভীর সমূহ দ্বারা দংশিত হচ্ছি, জন্মমৃত্যুর ক্লেশে দগ্ধীভূত, সেই অবস্থায় আপনি আমার প্রতি করুণার দৃষ্টিপাত করলেন। এই প্রকার করুণার উদয়ে আপনার নবনীতুল্য কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। হে লোকাতীত পরম প্রভু, আপনি শ্রীগুরুরূপ ধারণ করে আমার কামাদি অবিদ্যা ধ্বংস করেছেন। সুদর্শনচক্র সদৃশ আপনার দর্শন দ্বারা ঐ কুম্ভীরসকলকে ছেদন করে তাদের করাল-দংষ্ট্রা থেকে আমাকে মুক্ত করেছেন। আমার ইচ্ছানুযায়ী আপনি নিজ চরণকমলের দাসীরূপে নিযুক্ত করার জন্য আমার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করেছেন। আমায় যন্ত্রণা মুক্ত করে বারংবার নিজ নাম গুণের শ্রবণ-কীর্তন স্মরণাদি দ্বারা আমাকে শোধন করেছেন।

আমাকে আপনার প্রিয় ভক্তগণের সঙ্গদানের দ্বারা সেবা-প্রণালী ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আমি এত অধম, মুর্খ যে একদিনের জন্যও প্রভুর পরিচর্যা করলাম না। আমার ন্যায় দুরাচারী ব্যক্তি দণ্ডযোগ্য হলেও আপনি দণ্ডদান না করে আমাকে আপনার দর্শন-মাধুরী পান করালেন।

হে প্রভু! আপনার মুখপদ্ম নিঃসৃত বানী 'আমি ঋণী হলাম' শ্রবণ করে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে এখন আমি কি করি? পাঁচ, সাত, আট বা লক্ষকোটি যে অপরাধ আমার বর্তমান, সেগুলি ক্ষমা করতে বলাও নিতান্ত ধৃষ্টতা। এই সকল অপরাধ অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং যেগুলির ফল ইতিমধ্যেই ভোগ হয়েছে তাছাড়া যেগুলির ফল অবশিষ্ট আছে, তার সমস্ত ফল যেন ভোগ করি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি না।

সম্প্রতি জলভরা মেঘ, নীলপদ্ম এবং নীলমনির সঙ্গে আপনার শ্রীঅঙ্গের, চন্দ্রমার সঙ্গে শ্রীমুখের এবং নব পল্লবের সঙ্গে শ্রীচরণের উপমা দিচ্ছিলাম। এখন আপনার প্রকৃত সৌন্দর্য দর্শন করে বুঝতে পারছি যে দুর্বুদ্ধিবশতঃ আমি মহা অপরাধ করেছি। আসলে তুচ্ছ সরিষার সঙ্গে কনকশিখরের, চনক কণার সঙ্গে চিন্তামনির, শৃগালের সঙ্গে সিংহের, মশকের সঙ্গে গরুড়ের তুলনা করার



চেষ্টা করা মুর্খতারই নামান্তর। সেই সময় আমি প্রভুকে স্তব করতে গিয়ে নিজের মুর্খতাকেই জনসমাজে প্রচার করেছি। কিন্তু এখন আপনার শ্রীমূর্তির রূপ বৈভব দর্শণ করে তর্জমা করার আর ইচ্ছা নাই। তাই ধৈর্য রহিতা গাভীর দন্তপংক্তির ন্যায় আমার বাক্য আর কখন ও যেন শ্রীমূর্তির সৌন্দর্য কল্পলতাকে দূষিত করতে সমর্থ না হয়।

এইভাবে ভক্ত বহু প্রকারে বিলাপ করতে থাকলে ভগবান তার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হন। তারপর ভক্তের (বিশেষ করে প্রেয়সী ভাবযুক্ত ভক্তের) নিকট ইচ্ছানুরূপ যথাসম্ভব মধুর লীলা সহ শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রকাশিত করেন। ভগবান ভক্তকে শ্রীবৃন্দাবন, কল্পবৃক্ষ, মহাযোগপীঠ, স্বপ্রেয়সীশ্রেষ্ঠা বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধা ও তার ললিতাদি সখীগণ, মঞ্জরীগণ, সুবলাদি সখাগণ, গাভীগণ, শ্রীযমুনা, গোবর্ধন, নন্দীশ্বরগিরি, ভাণ্ডিরবন দর্শণ করান। তারপর তিনি সেখানে নন্দ মহারাজ, যশোদা মা, ভ্রাতা, আত্মীয় দাসাদি সমস্ত ব্রজবাসীকে প্রকাশ করেন। এইভাবে রসের উৎকর্ষ সহ সমস্ত কিছু দর্শন করিয়ে ঐ ভক্তকে আনন্দজনিত মোহ তরঙ্গিনীতে নিমগ্ন করে স্বয়ং পরিকরগণ সহ অন্তর্হিত হয়ে যান।

কিছু সময় পরে পুনরায় চেতনা লাভ করে ভক্ত ভগবানকে দর্শন করতে চক্ষু উন্মীলন করলেও আর তাঁকে দেখতে পান না, তখন ক্রন্দন করতে থাকেন। তিনি চিন্তা করেন,,"আমি কি স্বপ্ন দেখলাম? না, না কেননা শয্যার আলস্য ও চোখে ঘুম ঘুম ভাব কোনোটাই নেই। তবে কি এটা কোনো মায়া? না, না মায়া কখনো এরূপ আনন্দ দিতে পারে না। অথবা এটা কি আমার মনের ভ্রম? না তাও নয়, কারণ তাহলে মনে দুঃশ্চিন্তার লক্ষণ প্রকাশ পেত। কিংবা এটা কি আমার মনোভিলাষের পরিণাম প্রাপ্ত কোনো কল্পিত বস্তুবিশেষ? না, না, তাও নয় কারণ কল্পিত বস্তু কখনো যা দেখলাম, তার ধারে কাছেও আসতে সমর্থ নয়। তবে কি এটা হৃদয়ে ভগবদ্ স্ফুর্ত্তির লক্ষণ? না, তাও হতে পারে না, কারণ পূর্বে যে সকল ভগবদ্ স্ফুর্ত্তি স্মরণ করতে পারছি সেগুলি কখনোই এরূপ সুস্পষ্ট নয়।"

এই প্রকার নানা সংশয়ের বশবর্তী হয়ে ভক্ত ভূমিতে পতিত হয়ে ধূলি ধূসরিত হতে থাকেন। কখনও বা বার বার ভগবানের দর্শন প্রার্থনা করেও নিরাশ হয়ে ক্রন্দন ও মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় এবং কখনো বসেন, কখনো উঠে দাঁড়ান, দৌড়ে বেড়ান, পাগলের ন্যায় উচ্চৈস্বরে বিলাপ করতে থাকেন। কখনো বা ধীর ব্যক্তি ন্যায় মৌন অবলম্বণ করে বসে থাকেন এবং কখনো কখনো ভ্রষ্টাচারের ন্যায় নিত্যকর্ম বন্ধ করে দেন। কখনো বা ভূতে পাওয়া ব্যক্তির ন্যায় প্রলাপ বকতে থাকেন।

পরে যদি কোনো ভক্ত বন্ধু সান্তনা দিতে এসে, কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তখন তাঁকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলেন। সেই ভক্ত যদি তাকে বুঝিয়ে দেন, 'বহুভাগ্যের ফলে তোমার ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়েছে," তবে কিছু সময়ের জন্য প্রকৃতিস্থ হয়ে সুখ অনুভব করেন।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার বিলাপ করতে শুরু করেন, "হায়, হায়, কেন পুনরায় আমি ভগবানের দর্শন লাভ করতে পারছি না? তাহলে এটা কোনো বৈষ্ণবচূড়ামণি মহাভাগবতের আমার ন্যায় অধমের প্রতি অহৈতুকী কৃপার ফলেই হয়েছিল? আমি নিতান্ত দুর্ভাগা বলে কোনদিন বিন্দুমাত্র ভগবানের সেবা করি নাই, তাই বোধ হয় 'ঘুণাক্ষর ন্যায়'–(ঘুণ কাঠ বা বাঁশ কাটতে থাকে, দৈবাৎ কোনো কোনো কাটা অংশ অক্ষরের ন্যায় হয়ে যায়, সেই অক্ষরাকৃতি কাটাকে ঘূণাক্ষর বলে) এর মতো কোনো প্রকারে তথাকথিত ভগবৎ সেবা-প্রকৃত সেবার ফল প্রদান করেছিল। অথবা দোষের সমুদ্রে নিমজ্জিত অতি ক্ষুদ্র আমাকে পরমদয়ালু শ্রীভগবান অহৈতুকী করুণাবশতঃ দর্শণ দান করেছিলেন?

"হায়, হায় এখন আমি কি করি? কোন মহাভাগ্যের ফলে এই নিধি আমার করতলগত হল এবং কোন্ অপরাধের ফলেই বা হস্তচ্যুত হল? আমি এখন নিতান্ত অসহায়, আমার মাথা ঘুরছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। এই প্রকার



বিপদে কোথায় যাব? কি করব? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করব? মহাশূন্যের ন্যায়, নিরাশ্রয়ের ন্যায়, দাবানলে দগ্ধ বনের ন্যায় আমাকে যেন ত্রিভুবন গ্রাস করতে আসছে। এই লোকসঙ্গ থেকে দূরে নির্জনে গিয়ে কিছুক্ষণ এই বিষয়ে চিন্তা করি। এই বলে নির্জনে গিয়েও ভক্ত আবার আক্ষেপ করতে থাকেন, "হে সুন্দর মুখারবিন্দ, পরম অমৃতময়, বিপিনবিহারী, আপনার গলদেশে শোভিত বন ফুল মালার সৌরভে অলিকুল চঞ্চল হয়ে চতুর্দিকে বিচরণ করছে। আমি কেমন করে পুনরায় মূহূর্তের জন্য আপনার দর্শন লাভ করব? আমি একবার মাত্র আপনার মাধুর্যামৃত আস্বাদন করেছি, আর কি ঐ অপরূপ মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আপনার সেবা করতে সমর্থ হব না?" ভক্ত এইপ্রকার বিলাপ করতে করতে ভূমিতে গড়াগড়ি যান, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে থাকেন, উন্মাদগ্রস্ত হয়ে যান। হঠাৎ প্রতিদিকে ভগবানকে দর্শন করে আনন্দে বিভোর হয়ে কখনো যেন তাঁকে আলিঙ্গন করে হাসতে থাকেন, কখনো বা নৃত্য করতে থাকেন, কখনও গান করতে থাকেন। এইরূপ অলৌকিক ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে করতে নিজের দেহও থাকল কি না, তারও অনুসন্ধান করেন না। যথাসময়ে ভক্ত জড় শরীর ত্যাগ করে, বুঝতে পারেন, এখন একমাত্র আমার আরাধ্য ভগবান সেই করুণাসাগর সাক্ষাৎ আবির্ভূত হয়ে আমাকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করে ভগবদ্‌ধামে নিয়ে যাবেন। এইভাবে ভক্ত জীবনের অন্তিম লক্ষ্যে উপনীত হন।

**"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গো হথ ভজন ক্রিয়া।**
**ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।**
**অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।**
**সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।"**

প্রথমে শ্রদ্ধা, তার পর সাধুসঙ্গ, তার পরে ভজন ক্রিয়া, তারপর অনর্থনিবৃত্তি, তারপরে ভজনে নিষ্ঠা, রুচি এবং তারপর ভগবানে আসক্তি, তারপর ভাব

এবং পরিশেষে প্রেমের উদয় হয়ে থাকে। সাধকগণের ভক্তির সর্বোচ্চ পর্যায় প্রেমে উপনীত হওয়ার এই প্রকার ক্রম নিরূপণ করা হয়েছে।"

(ভঃ রঃ সিঃ১/৪/১৫-১৬)

এই শ্লোকে বর্ণিত ভক্তির স্তরসমূহের সবিশেষ বর্ণনা এই মাধুর্য-কাদম্বিনী গ্রন্থে করা হয়েছে। তাছাড়া এই স্তরসমূহের পরেও উত্তরোত্তর অতীব আস্বাদ্য স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব এই কয়টি স্তরের কথা জানা যায়। সেগুলি ভক্তিলতার সর্বোচ্চ শাখায় অবস্থিত সুপক্ক ফলের ন্যায়। এইসব স্তরে শ্রীকৃষ্ণমিলনের শৈত্য (কোটি কোটি চন্দ্রের স্নিগ্ধতার ন্যায়) বিরহের উষ্ণতা এবং অন্তরে বিভিন্ন ভাবের আলোড়ন এত অধিক যে তা সাধকদেহ সহ্য করতে অক্ষম। সুতরাং এই দেহে তাদের প্রকাশ অসম্ভব বলে সেই বিষয়ে এখানে আর আলোচনা করা হল না।

## ভক্তির স্তরসমূহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ঃ

এই মাধুর্য কাদম্বিনী গ্রন্থে রুচি, আসক্তি, ভাব এবং প্রেমের লক্ষণ এবং তাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের কথাই বলা হয়েছে। এবিষয়ে বহু প্রমান থাকলেও তা উল্লেখ করা হয় নাই। প্রমানের অপেক্ষা থাকলে অনুভবপথে কর্কশতাই বোধ হয়ে থাকে, তথাপি কেউ যদি প্রমানের অপেক্ষা করে তার জন্য নিম্নে কয়েকটি শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লেখ করা হল।

**রুচি ঃ** তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে।।



হে মহর্ষি! পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি রুচিলাভ করা মাত্রই ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমি স্থিরমতি সম্পন্ন হয়েছিলাম। সেই রুচি যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই আমি বুঝতে পারি যে আমার অজ্ঞানতার ফলে আমাকে এই স্থুল এবং সুক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করতে হয়েছে। কেননা ভগবান এবং জীব উভয়ই প্রপঞ্চাতীত।

(ভাঃ ১/৫/২৭)

আসক্তি ঃ **চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে।।**

যেই অবস্থায় জীবের চেতনা প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাকে বলা হয় বদ্ধজীবন। কিন্তু সেই চেতনা যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তিনি মুক্ত হন। (ভাঃ ৩/২৫/১৫)

ভাব ঃ **তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেহনুপদং বিশৃন্বতঃ
প্রিয় শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রুচিঃ।।**

হে ব্যাসদেব, যেখানে সেই ঋষিরা প্রতিদিন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপের বর্ণনা করতেন। তাঁদের অনুগ্রহে আমি তা শ্রবণ করতাম। এই ভাবে নিবিষ্ট চিত্তে তা শ্রবণ করার ফলে প্রতি পদে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমার রুচি বৃদ্ধি পেতে থাকে। (ভাঃ ১/৫/২৬)

প্রেম ঃ **প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গোহ তিনির্বৃতঃ।
আনন্দসম্প্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে।।**

হে ব্যাসদেব, সেই সময় প্রবল আনন্দের অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ার ফলে আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুলকিত হয়েছিল। আনন্দের

সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে আমি সেই মুহূর্তে ভগবানকে এবং নিজেকেও দর্শন করতে পারছিলাম না। (ভাঃ ১/১৬/১৭)

**রুচির লক্ষণ ঃ**

**তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র**
**পীযূষশেষ সরিতঃ পরিতঃ শ্রবন্তি।**
**তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-**
**স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশন তৃড্ ভয়শোকমোহাঃ।।**

সাধুসঙ্গে যদি কেউ অমৃত ধারাবাহিণী সরিৎস্বরূপ ভগবানের লীলামৃত শ্রবণ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন, এবং তাহলে তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা আদি জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি বিস্মৃত হন, এবং তিনি সমস্ত ভয়, শোক ও মোহ থেকে মুক্ত হন। (ভাঃ ৪/২৯/৪০)

**আসক্তির লক্ষণ ঃ**

**শৃন্বণ্ সুভদ্রানি রথাঙ্গপানের্জন্মানি কর্মানি চ যানি লোক।**
**গীতানি নামানি তদর্থ কানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ।।**

সমস্ত প্রকার জড় বিষয়ে নিস্পৃহ হয়ে চক্রপানি শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় জন্ম, লীলাসমূহ, নাম শ্রবণ কীর্তন করতে করতে এই জগতে লজ্জা শুন্য হয়ে বিচরণ করা উচিত। (ভাঃ ১১/২/৩৯)

**ভাবের লক্ষণ ঃ**

**যথা ভ্রাম্যত্যযো ব্রহ্মণ্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।**
**তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া।।**



হে ব্রাহ্মণগণ, লোহা যেমন চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আপনা থেকেই চুম্বকের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনই আমার চেতনা ভগবান শ্রীহরির দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে চক্রপানির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই আমার আর কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই।

(ভাঃ ৭/৫/১৪)

**প্রেমের লক্ষণ ঃ**

**এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগে দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।**
**হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।**

এইরূপ ব্রতচারী ভজনশীল ব্যক্তির উচ্চৈস্বরে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করতে করতে প্রেমের সঞ্চার হয়। তখন তিনি কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও গান, কখনও বা নৃত্য করতে থাকেন। (ভাঃ ১১/২/৪০)

**ভগবৎ-স্ফূর্তি ঃ**

**প্রগায়তঃ স্ববীর্যানি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।**
**অহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি।।**

যখনই আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত শ্রুতিমধুর মহিমা এবং কার্যকলাম কীর্তন করতে শুরু করি। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার হৃদয় আসনে আবির্ভূত হন, যেন আমার ডাক শুনে তিনি চলে আসেন।

(ভাঃ ১/৬/৩৩)

**সাক্ষাৎ দর্শন ঃ**

**পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ**
**প্রসন্নবক্তারুণ লোচনানি।**
**রূপানি দিব্যানি বরপ্রদানি**
**সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বদন্তি।।**

(শ্রীকপিলদেব বললেন) হে মাতঃ আমার ভক্তেরা সর্বদাই উদীয়মান প্রভাতী সূর্যের মতো অরুণ-লোচনযুক্ত আমার প্রসন্ন মুখমণ্ডল সমন্বিত রূপ অবলোকন করেন। তাঁরা আমার সর্বমঙ্গলময় বিভিন্নরূপ দর্শন করতে চান, এবং অনুকূলভাবে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চান। (ভাঃ ৩/২৫/৩৫)

## ভগবদ্দর্শন প্রাপ্ত ভক্তের প্রতিক্রিয়া ঃ

তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-
বিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রানাংশ্চ ভক্তি-
রনিচ্ছতো মে গতিমন্বীং প্রযুঙ্ক্তে।।

ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল এবং আকর্ষক রূপ দর্শন করে এবং তাঁর অত্যন্ত মধুর বাণী শ্রবণ করে, শুদ্ধভক্তেরা তাদের চেতনা হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি অন্যসমস্ত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন হয়। তার ফলে তাঁদের মুক্তি লাভের স্পৃহা না থাকলেও, তাঁরা আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যান। (ভাঃ ৩/২৫/৩৬)

## ভগবদ্দর্শন প্রাপ্ত ভক্তের কার্যকলাপ ঃ

দেহঞ্চনশ্বর মবস্থিমুত্থিতম্বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোহধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমুথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ।।

মদ্যপ (মাতাল) ব্যক্তি যেমন তার শরীরে পরিধেয় বসন আছে কি নেই কিছুই বুঝতে পারে না। তদ্রুপ সিদ্ধপুরুষ যিনি স্বরূপ জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি তাঁর নশ্বর দেহ আসন হতে উত্থিত বা পুণরায় স্থিত-কিছুই অনুসন্ধান করতে পারেন না। (ভাঃ ১১/১৩/৩৬)



শ্রীমদ্ভাগবত থেকে উক্ত শ্লোকগুলি দ্বারা প্রমান বিচার করা যেতে পারে।

## প্রেম আবির্ভাবের ক্রম ঃ

এই গ্রন্থের সার বিষয় হচ্ছে যে, অহঙ্কারের দুটি বৃত্তি আছে! 'অহন্তা' বা আমি এবং 'মমতা' বা 'আমার'। জ্ঞানের দ্বারা উহার ধ্বংস হলে জীবের মোক্ষলাভ হয়। দেহ, গৃহ আদি বিষয়ে এই বৃত্তি জীবের বন্ধণের কারণ। (অর্থাৎ আমি এই দেহ, আমার গৃহ ইত্যাদি) আমি প্রভুর নিজজন, আমি প্রভুর সেবক সপরিকর রূপ, গুণ ও মাধুর্যের মহাসাগর প্রভুই আমার সেব্য। এই ভাবে নিজেকে ভগবানের সেবক (অহন্তা) এবং পার্ষদ সহ ভগবদ্বিগ্রহে মমতা হলে তাকে প্রেম বলা হয়।

প্রেমে প্রগতির ক্রম হচ্ছে-যখন অহন্তা ও মমতা ব্যবহারিক ভাবে অত্যন্ত গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় তখন ঐ ব্যক্তি চিন্তা করেন, "আমি সংসারে থেকেই বৈষ্ণব হব এবং ভগবানের সেবা করব।" এইভাবে যখন সৌভাগ্যের ফলে শ্রদ্ধার কণামাত্র জন্মে, তখন পারমার্থিক গন্ধ যুক্ত ঐরূপ জীবের ভক্তিতে অধিকার জন্মে। তখন সাধুসঙ্গের প্রভাবে পারমার্থিক গন্ধের গাঢ়তা জন্মে, কিন্তু তখনও জড় আসক্তি পরিপূর্ণরূপে (আত্যন্তিক) বর্তমান থাকে। তারপর অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া স্তরে অহন্তা ও মমতার পরমার্থ বিষয়ে একদেশবর্তিনী ও জড়বিষয়ে পূর্ণ বৃত্তি জন্মে। নিষ্ঠাস্তরে অহন্তা ও মমতার বৃত্তি পরমার্থ বিষয়ে বহুদেশব্যাপিনী ও জড়বিষয়ে প্রায়িকী হয়। রুচি উৎপন্ন হলে ঐ বৃত্তি পরমার্থবিষয়ে পূর্ণা ও জড়বিষয়ে বহু দেশব্যাপিণী হয়ে থাকে। আসক্তি জাত হলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ বিষয়ে পূর্ণা ও জড়বিষয়ে একদেশ ব্যাপিনী হয়ে থাকে। তারপর ভাবের উদয় হলে ঐ বৃত্তি পরমার্থবিষয়ে আত্যন্তিকী ও জড় বিষয়ে "বাধিতানুবৃত্তি ন্যায়ের" মতো আভাসময়ী হয়ে থাকে। প্রেম জন্মিলে অহন্তা ও মমতা বৃত্তি পরমার্থ বিষয়ে পরমাত্যন্তিকী ও জড়বিষয়ে একেবারে সম্বন্ধরহিত হয়ে থাকে।

এই প্রকার ভজন ক্রিয়ার প্রারম্ভে ভগবানের ধ্যান জড়-ভাবনাযুক্ত ও মুহূর্তের জন্য হয়ে থাকে। নিষ্ঠা হলে সেই ধ্যান জড় বিষয়ের আভাসমাত্র থাকে। 'রুচি' স্তরে ঐ ধ্যান জড়বিষয় রহিত এবং বহুকাল ব্যাপী বর্তমান থাকে। তারপর আসক্তি জন্মিলে সেই ধ্যান অত্যন্ত গাঢ় হয়ে থাকে। ভাবে ধ্যানমাত্রেই ভগবৎ স্ফূর্তি হয়। প্রেমে উপনীত হলে শুধু ভগবৎ স্ফূর্তিই নয়, ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়ে থাকে।

| সাধন-ভজনের বিভিন্ন অবস্থা | লৌকিক ব্যবহারে অহন্তা ও মমতা | ভগবদ্বিষয়ে অহন্তা ও মমতা | ভগবদ্ধ্যান |
|---|---|---|---|
| শ্রদ্ধা | অতিসান্দ্র | স্বল্পমাত্র | – |
| সাধুসঙ্গ | | গন্ধের গাঢ়ত্ব | – |
| ভজনক্রিয়া (অনিষ্ঠিতা) | পূর্ণা (পূর্ণরূপে) | একদেশব্যাপিনী (কিছু অংশে নিযুক্ত) | বিষয়বার্ত্তার গন্ধযুক্ত এবং ক্ষণিক |
| নিষ্ঠা | প্রায়িকী (প্রায়রূপেই) | বহুদেশব্যাপিনী (বহু অংশে নিযুক্ত) | বিষয়বার্ত্তার আভাস |
| রুচি | একদেশব্যাপিনী (কিছু অংশ মাত্র) | প্রায়িকী (প্রায়রূপেই নিযুক্ত) | বিষয়বার্ত্তাহীন ও বহুকালব্যাপী |
| আসক্তি | গন্ধমাত্র | পূর্ণা (পূর্ণরূপে নিযুক্ত) | অতিগাঢ় |
| ভাব | আভাসমাত্র | আত্যান্তিকী | ধ্যানমাত্র ভগবানের স্ফূর্ত্তি |
| প্রেম | কিছুমাত্রও নহে | পরম আত্যান্তিকী | ভগবৎ-স্ফূর্ত্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও ভগবদ্দর্শন লাভ |

**মাধুর্য বারিধেঃ কৃষ্ণ চৈতন্যা দুদ্ধৃতৈঃ রসৈঃ।**
**ইয়ং ধিনোতু মাধুর্যময়ী কাদম্বিনী জগৎ।।**

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মাধুর্যবারিধি উদ্ধৃতা রসের দ্বারা এই মাধুর্যময়ী কাদম্বিনী তৃষ্ণার্ত বিশ্বকে তৃপ্ত করুন।

–ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত মাধুর্য্য-কাদম্বিনী–গ্রন্থে 'পূর্ণমনোরথ' নামক অষ্টম-অমৃত-বৃষ্টি।

# শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ১৫৬০ শকাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে পিতা শ্রীরাম নারায়ণ চক্রবর্ত্তী এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু মাতৃ পরিচয় জানা যায় না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বাল্যকালে দেবগ্রামে ব্যাকরণ পাঠ সমাপন করে সৈয়দাবাদ (মুর্শিদাবাদ) নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী থেকে মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইনি বহু দিন গুরুগৃহে অবস্থান করেন এবং তথায় থেকে বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন। প্রবাদ আছে যে পাঠদ্দশাতেই ইনি একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। সংসারে আবদ্ধ করে রাখবার জন্য পিতা তাঁকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিছুকাল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গৃহে ছিলেন। অনন্তর গৃহ ত্যাগ করে তিনি বৃন্দাবনবাসী হন। স্বজনগণ গৃহে ফিরায়ে আনাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বৃন্দাবনধামে গিয়ে রাধাকুণ্ড তীরে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটীরে তদীয় শিষ্য শ্রীমুকুন্দ দাসের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গোকুলানন্দ বিগ্রহের সেবা করতেন। তিনি বৈষ্ণব সমাজে শ্রীহরিবল্লভ দাস নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর চক্রবর্ত্তী উপাধিটি ভক্তগণ দিয়েছিলেন।

বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্ত চক্রে বর্ত্তিতত্বাচ্চক্রবর্ত্তাখ্যয়াভবৎ।। (স্বপ্ন বিলাসামৃত)

ভক্তি বর্ত্ম প্রদর্শন হেতু বিশ্বের নাথ, এবং ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এইজন্য চক্রবর্ত্তী আখ্যায় বিভূষিত হয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ এবং ভাগবত ও গীতার সারার্থ দর্শিনী টীকা সমূহের ভাষা অত্যন্ত সরল, প্রাঞ্জল ও ভক্তিরসপূর্ণ। তাঁর রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য, স্বপ্নবিলাসামৃত কাব্য, মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী, স্তবামৃতলহরী প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঐ গ্রন্থসমূহই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরের বস্তু। এই মাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থখানি তন্মধ্যে অন্যতম যা উত্তমরূপে অনুশীলন করলে তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের ভাব-গাম্ভীর্য অনুভব করা যায়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনার কথা শ্রুত হয় যে, তিনি যে স্থানে ভাগবত লিখতেন, সেই স্থানে পুঁথিতে জল পড়লেও জলের দ্বারা ভিজত না, পাতাগুলি অটুট থাকত।

আনুমানিক ১৬৩০ শকাব্দে মাঘ বাসন্তী পঞ্চমী তিথিতে তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রকট হন।

❋❋❋